বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমানস

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলকাতা · বোম্বে · দিল্লী · হায়দ্রাবাদ

প্রকাশক :
রাজীব নিয়োগী
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩

প্রথম সংস্করণ :
পৌষ ১৩৬৭
জানুয়ারি ১৯৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীশিবনাথ পাল
প্রিণ্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শিবব্রত রায়

মুখবন্ধ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই একটি নাম আমাদের মধ্যে যে শ্রদ্ধা, যে আবেগ, যে গভীর অনুভূতির সৃষ্টি করে সর্বাংশে তা প্রকাশ করা অসম্ভব। আজ থেকে একশো আশি বছর আগে গণ্ডগ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি 'অজেয় পৌরুষ' ও 'অক্ষয় মনুষ্যত্ব' -এর অধিকারী হয়েছিলেন। আর তাঁর মৃত্যুর এক শতাব্দীরও পর তিনি সমান প্রাসঙ্গিক। তাঁর দয়া, বিশাল পাণ্ডিত্য, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান, শিশু বয়স থেকে সঠিক মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নে তাঁর ভূমিকা 'বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী' হিসাবে তাঁর অনন্য ভূমিকা, বিধবাবিবাহ প্রচলনে তাঁর অকুতোভয় সংগ্রাম-সব মিলে তাঁকে এমন এক উচ্চতা দান করেছে যে তার পরিমাণ করা সুকঠিন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মতো মনীষীদের চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, তাঁরা চিন্তায় চেতনায়, দৃষ্টিভঙ্গির অসাধারণত্বে তাঁদের নিজের যুগকে অতিক্রম করে সুদূর ভবিষ্যতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারেন। তাই তাঁরা যুগোত্তীর্ণ প্রতিভার অধিকারী, তাই সমকালের মানুষের মননে তাঁদের যথার্থ প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে না।

বিশেষ জ্ঞানই বিজ্ঞান। আর বিশেষ জ্ঞানের ভাণ্ডারীরাই বিজ্ঞানী। এই বিশেষ জ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞানীরা স্থিতবস্থায় কখনও সন্তুষ্ট থাকতে জানেন না। স্বীয় ক্ষমতাবলে তাঁরা কুসংস্কারের বাধা অতিক্রম করে, অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূরে ঠেলে মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। সেজন্য যুগে যুগে তাঁরা যন্ত্রণা ও নিপীড়নের শিকারও হন। বৃহত্তর অর্থে ঈশ্বরচন্দ্রও বিজ্ঞানী — ভাষাবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী। তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডে সমাজকে যেমন তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তেমনি আবার প্রচণ্ড যন্ত্রণার শিকারও তাঁকে হতে হয়েছে। সব থেকে বড় কথা অল্প বয়সের বালক-বালিকাদের বিজ্ঞান মনস্কতা সৃষ্টির জন্য বিদ্যাসাগরের অমূল্য অবদান 'বোধোদয়' পুস্তক যা সকলের কাছে সেই সময়ে ছিল এক বিস্ময়কর অবদান।

'বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমানস' পুস্তিকার স্বল্প পরিসরে (৫৮ পৃষ্ঠা) লেখক তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্রের বিজ্ঞান মনস্কতার দিকটি সম্পর্কে

আলোকপাত করেছেন। তিনি তাঁর 'বিজ্ঞানমানস', বিজ্ঞানমনস্কতা বা বৈজ্ঞানিক মানসিকতা'র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের এই উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেছেন: "যন্ত্রপাতি ব্যবহাররত বৈজ্ঞানিক নামে অভিহিত সবাইকে আমি বৈজ্ঞানিক বলে ধরি না। আমার কাছে বৈজ্ঞানিক মনটাই আসল।" এবং বিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলি বর্ণিত "Scientific humanism"- এর বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে প্রধান দশটি, যথা— সংস্কারমুক্ত চেতনা, জাতীয়তাবোধ, প্রতিবাদী মানস, আধুনিকতা, যুক্তিবাদ, সাংগঠনিক প্রবণতা, আত্মমর্যাদাবাদ, ত্যাগাদর্শ, পরার্থপরতা ও মূল্যবোধ-এর কথা বলেছেন। ভীমিকা ('বিদ্যাসাগর মানস-এর প্রেক্ষাপট') ও 'উপসংহার' বাদে 'বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশনায় বিদ্যাসাগর', 'বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের চরিত্রচিত্রন', 'চিকিৎসক বিদ্যাসাগর' ইত্যাদি শিরোনামের পাঁচটি পরিচ্ছেদে লেখক ঈশ্বরচন্দ্রের বিজ্ঞানমানসের একটি সংহত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি তাঁর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জন্য পাঠকের ধন্যবার্দাই হবেন সন্দেহ নেই। এই পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

বিমান বসু

কার্যকরী সভাপতি

বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি

কোন্ পাতায় কি ?

১

বিদ্যাসাগর মানস-এর প্রেক্ষাপট

উনিশ শতকের যে সমাজে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সেখানে তখন 'চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার'... 'আকাশে মৃত্যুর বিচরণ'... 'বঙ্গসমাজ তখন প্রেতভূমি তুল্য'।[১] 'বিচিত্র তরঙ্গসংকুল এ ধর্মাচরণ মহাসাগরের কাণ্ডারী একমাত্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত, যাদের মধ্যে বেদ উপনিষদ চর্চা একেবারেই ছিল না। ঋগ্বেদের কল্পিত মাত্র তেত্রিশটি প্রকৃত দেবতা তখন কিম্বদন্তী তেত্রিশ কোটি দেবতায় সম্প্রসারিত পূজিত ও প্রচারিত; অর্থাৎ পৌত্তলিকতার বিপুল মহোৎসব।[২] এহেন শ্মশান-সমাজে মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যাঁকে এগিয়ে আসতে হয়েছিল— তিনিই বিদ্যাসাগর।

শিরোনামী আলোচনার উদ্দেশ্য বিদ্যাসাগরের 'বিজ্ঞানমানস' অন্বেষণ। 'বিজ্ঞান-মানস' বা 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা' বা 'বিজ্ঞানমনস্কতার' অর্থ জড় বিজ্ঞানী হওয়া নয় বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি অম্বিষ্ট থাকাও নয়। এ প্রসঙ্গে আমরা স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের উদ্ধৃতি অনুসরণ করতে পারি: "যন্ত্রপাতি ব্যবহাররত বৈজ্ঞানিক নামে অভিহিত সকলকে আমি বৈজ্ঞানিক বলে ধরি না। আমার কাছে বৈজ্ঞানিক মনটাই আসল।"[৩] বস্তুতঃ 'বিজ্ঞানমানস'— সে জাতীয় প্রবণতার কথাই ব্যক্ত "যেখানে থাকবে খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, দৃষ্টবস্তু বা ঘটনার পূর্ণ ও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন, গভীর চিন্তাশীলতা ও তন্ময়তা এবং যাচাই না করে কিছু মেনে না নেবার প্রবণতা। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির সামিল হবে শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার ক্ষমতা, ভাবপ্রকাশের সুষ্ঠুতা, মতুয়ার (dogmatic) বুদ্ধি থেকে মুক্তি এবং যার সত্যতা বক্তা ভিন্ন অন্য কারও কাছে বক্তার পথ অনুসরণ করেও প্রতীয়মানযোগ্য নয়— এমন কোন যুক্তির উপস্থাপনা না করা।"[৪]

বিদ্যাসাগরের এহেন 'বিজ্ঞান-মানস' অনুসন্ধান প্রাক্কালে সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটের যাচাই বাছাই খুবই জরুরী, না হ'লে মূল্যায়নে যথেষ্ট আড়ষ্টতা থাকবে— গ্রহণেও সংশয় সংকোচ এড়ানো কষ্টকর হবে।

বিদ্যাসাগরকে (১৮২০-১৮৯১) উনিশ শতকের প্রতিভূরূপে চিহ্নিত করা মোটেই অবৈজ্ঞানিক প্রত্যয় নয়; উনিশ শতক মানেই ভারতীয় নবজাগরণের প্রবাহ—আর

সেই প্রবাহের প্রথমার্ধকে বলে প্রস্তুতিপর্ব (রামমোহন, ইয়ংবেঙ্গল ও তত্ত্ববোধিনীর প্রকাশ) এবং দ্বিতীয়ার্ধকে বলে প্রকাশ পর্ব (মধুসূদন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ)। বস্তুতঃ বিদ্যাসাগরের কালকে দুই পর্বের সংযোগস্থল রূপে লক্ষিত হয়—যে কালে 'বাংলার রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে বাঙলা তথা ভারতেরও নবযুগের আবির্ভাব ঘটেছে'। এবং সঙ্গতভাবেই নবচেতনার আলোকদ্যুতির অন্যতম মুখ্য রূপকার রূপে তাঁকে ভাবা ইতিহাসেরই সিদ্ধান্ত। আমরা এখন সেই ইতিহাস থেকে বিদ্যাসাগর মানস অনুসন্ধানে সচেষ্ট হবো।

রেনেসাঁসের তাৎপর্য প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বুরখার্ডের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, "মধ্যযুগীয় জীবনধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আধুনিক জীবনধারার উদ্বোধন রেনেসাঁসের মূল কথা। এই আন্দোলন ইতালিতে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। এই আন্দোলন দেখা দিয়েছিল ঠিক সেই সময় যখন ইতালিতে জমিভিত্তিক, গ্রামভিত্তিক সমাজের বদলে বাণিজ্যভিত্তিক, সহরভিত্তিক সমাজের বনিয়াদ গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। মধ্যযুগীয় জীবনধারার রক্ষক রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের গতিমুখ বিশেষভাবে পরিচালিত হয়েছিল। মধ্যযুগকে 'অন্ধকার যুগ' বলে চিহ্নিত করে এই আন্দোলন প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে নতুনের সন্ধান করেছিল। ধর্মনিরপেক্ষ, মানব-নির্ভর, আধুনিক জীবনধারার অভিব্যক্তি ছিল এই আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর প্রধান লক্ষণগুলি ছিল : সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের বদলে ব্যক্তিগত অধিকারের ওপর জোর, বংশ কৌলীন্যের বদলে গুণ কৌলীন্যের ওপর জোর, মানুষে মানুষে সমানাধিকার, নারী-পুরুষের সমানাধিকার, গরীব মানুষও মানুষ— এই চেতনার অভিব্যক্তি, ঐহিক জীবন ও সুখ ভোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ, ধর্মনিরপেক্ষতার মনোভাব, মানুষের ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পর্কে প্রত্যয়, সম্পূর্ণ মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় চেতনার উদ্বোধন ও দেশ সম্পর্কে গর্ববোধ, আন্তর্জাতিক ধ্যান-ধারণার উন্মেষ ইত্যাদি... এককথায়, মানুষ সম্পর্কে, পৃথিবী সম্পর্কে, দেশ সম্পর্কে নতুন চেতনার উন্মেষের মধ্যে অনুরণিত হয়েছিল রেনেসাঁসের মূল সুর।"[৫]

এই চেতনার পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল উনিশ শতকের বাংলায়। বিদ্যাসাগর নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত রামমোহনের সেই ঐতিহাসিক পত্র (১৮২৩) : "এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা যদি গবর্ণমেণ্টের আকাঙ্ক্ষা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎপরিবর্তে এদেশীয়দিগের উন্নতি বিধান যখন গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষাবিষয়ে উন্নত ও উদার নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যদ্দ্বারা অপরাপর বিষয়ের সহিত গণিত, জড় ও জীববিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থান বিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।"[৬]

অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনীর উদ্দেশ্য সম্পর্কেও যে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন পরবর্তীকালে ঐ পত্রিকার সঙ্গে তার সখ্যতায় সে সিদ্ধান্ত

আসে। সেখানেও তিনি লক্ষ্য করেছেন 'তত্ত্ববোধিনীর' পাতায় শতাব্দীর কান্না : "ছাত্রদের সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির পাশাপাশি গণিত, পদার্থবিদ্যা, শারীরবিধান ও নীতিবিদ্যা ও 'সসম্ভ্রমে ধনোপার্জনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত লোক-যাত্রা-বিধান, রাজনিয়ম ও নানাপ্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা' দেওয়া কর্তব্য।"[৭]

এহেন প্রেক্ষাপটে কর্মবীর বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। ১৮৫০-র শেষ ভাগ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবনের মধ্যাহ্নকাল। এর মধ্যে তিনি শিক্ষা সংস্কারমূলক একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছেন, বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন, মাতৃভাষায় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন ; ইংরাজী শিক্ষার সমর্থনে বক্তব্য রেখেছেন। সেই কর্মময় প্রবাহপথ অনুসরণ করলে দেখব, বিজ্ঞান সচেতনতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের একটি বড় দিক। তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির জন্য যে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেন তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, জীবনী, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি। ১৮৫২ সালের স্কলারশিপ পরীক্ষায় বিদ্যাসাগর রচিত প্রশ্নপত্রে রচনা লিখতে বলা হয়— "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনুশীলন থেকে যে উপকারগুলি পাওয়া যায় তার পরিচয় দাও"। 'বিদ্যাসাগর জীবন চরিত' নামে যে বইখানি লেখেন তাতে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতির চরিতকথা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শুধু তাই নয়, আধুনিক বিজ্ঞানচেতনার মানদণ্ড দিয়ে তিনি প্রাচীন ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে বলেছেন, "হিন্দুদর্শন শাস্ত্রের বেশীর ভাগই বর্তমান কালের অগ্রসর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন পণ্ডিতদের 'বেদে আছে' মনোবৃত্তির তিনি নিন্দা করেছেন।"[৮]

বর্ণিত অনুচ্ছেদে আমরা বিদ্যাসাগরের কর্মধারার পরিবৃত্তির রূপরেখা দিয়েছি যার মাধ্যমে তাঁর কর্মবিন্যাস কেবল পরিব্যক্তি তাঁর ইচ্ছা বা এষণা পরিব্যক্ত নয়। তাঁর এষণাই 'বিজ্ঞানমানস'— তা বিশ্লেষণই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইদানীং বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কিছু গ্রন্থে তাঁকে নাস্তিক প্রমাণ করে প্রগতিবাদী করার প্রবণতাও লক্ষ্যণীয়। কিন্তু, এ জাতীয় আলোচনা বৃহৎ চরিত্রের সরলীকরণের অপপ্রয়াস ঘটে ; তাতে 'মানুষ বিদ্যাসাগর'—খণ্ডিত হয়ে যান ; সত্যের অপলাপ — বিজ্ঞানের অমর্যাদা ঘটে।

এ গ্রন্থে আমরা সেই বিজ্ঞান আঁকতে চাইছি না। যা মানুষকে তার জীবনের তাৎপর্য খুঁজে পেতে দেবে না বা সমাজবিজ্ঞানীদের বলতে বাধ্য করাবে, "মানুষ আজ নতুনভাবে তার অস্তিত্বের মুখোমুখি হচ্ছে, অথচ এটিকে সে বুঝে উঠতে পারছে না।"[৯] বিজ্ঞান ও যুগযন্ত্রণার এক চরম দলিল চিত্রিত করেছেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, "অস্তিত্বের এই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করেছেন বহু পাশ্চাত্য মনীষী। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের আগেই গত শতাব্দীতে ফ্রান্জ্ কাফ্কা লিখেছিলেন, 'দ্য ট্রায়াল' এবং 'দ্য ক্যাসেল'। এই উপন্যাসদ্বয়ে তিনি আঁকতে চেয়েছেন মানুষের ছবি...তার যন্ত্রণা তার অভীপ্সা। আলবেয়ার কামু শুনিয়েছেন 'মিথ অব

সিসিফাস'-এর কথা। পাহাড় গড়িয়ে গড়িয়ে সিসিফাস পাহাড় চূড়ায় উঠতে চায়, অথচ চূড়ার কাছাকাছি এসেই পাথরটা নিচে পড়ে যায়। আবার চেষ্টা করে সিসিফাস, আবার গড়িয়ে পড়ে পাথর। আজকের মানুষ—কামুর কাছে সবাই সিসিফাস। ইউজিন আয়োনেস্কোর 'রিনো' নাটকে শহরবাসীরা সবাই আতঙ্কিত—গণ্ডার ঢুকে পড়েছে শহরে। ব্যাপক ভয়ের পরিবেশ সর্বত্র, অথচ গণ্ডারটিকে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় না। স্যামুয়েল ব্রেখ্‌ট্ লিখেছেন, 'ওয়েটিং ফর গোডো'। গোডো আসবেন, তাই অপেক্ষা করছে মানুষেরা — যুবাবৃদ্ধ সবাই। মাঝে মাঝে খবর আসছে—গোডো শিগ্‌গিরই আসছেন, তিনি এই এসে পৌঁছালেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোডো আর আসেন না। কাফ্‌কা-কামু—আয়োনেস্কো-ব্রেখ্‌ট্ সবাই আজকের মানুষের ছবি এঁকেছেন—বিভ্রান্ত মানুষ, রঙীন আশা ও মিথ্যা ভয়—কল্পনায় জর্জরিত সে মানুষ — যার জীবনের কোনও তাৎপর্য নেই— দিনযাপনের গ্লানি ছাড়া।"[১০]

এই প্রেক্ষাপট স্মরণে রাখলে বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমানস অনুধাবন সহজতর হবে। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাষা, বিজ্ঞান জ্ঞান সবই চেয়েছেন কিন্তু কোনটাই প্রাচ্যের তথা ভারতের ভাষা জ্ঞান প্রজ্ঞার বিনিময়ে নয়—তাকে বিলীন করেও নয়, তাই উগ্র 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীতে তাঁর সমবয়সী অনেক বন্ধু থাকলেও তিনি সে উদ্যোগের সামিল হতে পারেন নি, আবার ব্যক্তিজীবনে 'পণ্ডিত নামে আখ্যাত' হয়েও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পদে পদে লড়াই-এর ময়দানে নামতে হয় তাঁকে তাঁর প্রজ্ঞাই তাঁকে বলতে বাধ্য করেছে: 'বেদান্ত ও সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন'। যেমন বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, "কলিতে বেদমত চলে না"... যেমন বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, "উপনিষদের যে অংশ যুক্তির সঙ্গে মেলে না সে অংশ আমি বেদান্ত বলে স্বীকার করি না।" কার্যত সমগ্র বিচারে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসাই বিজ্ঞানভিত্তিক। বিদ্যাসাগর বর্জন করতে চেয়েছিলেন দেশীয় ধর্মাদর্শের আচারতন্ত্রকে ; যে আচারতন্ত্র কৌলীন্য প্রথাকে জিইয়ে রাখে, বহু বিবাহের মত অমানবিক প্রথার চর্চায় রত, সতীদাহের মত যন্ত্রণাক্লিষ্ট প্রথায় ইন্ধন দেয়। বস্তুতঃ তিনি ভারতীয় আদর্শের সার্থক ঋত্বিক।

বস্তুতঃ বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ কথিত 'মিলনতত্ত্বের' সাকার বিগ্রহ। একদিকে পাশ্চাত্যের বাহ্যিক জ্ঞান কৌশল (ভৌত বিজ্ঞান) অপর দিকে ভারতীয় আদর্শের অন্তর্জ্ঞান (চৈতন্যবোধ)-এর সার্থক সম্মিলন হয়েছিল তাঁর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে যাঁহারা নবযুগ প্রবর্তন করিবেন তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিমে তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে।"

বিদ্যাসাগরের জীবনী পাঠকমাত্রেই সম্যক অবগত আছেন, কী দুর্নিবার সংগ্রামেব মধ্য দিয়ে তাকে এগিয়ে আসতে হয়েছে দেশের শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের কাজে ; যত সহযোগিতা পেয়েছেন—তার বহুগুণ পেয়েছেন বিরোধিতা ও বিচ্ছিন্নতা। সঙ্গত

কারণেই প্রশ্ন থাকে কোন্ এষণায় বিদ্যাসাগর জীবন রণাঙ্গনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও অজেয় পুরুষকারকে ঋজু রেখেছিলেন জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক জুলিয়ান হাক্সলী (Julian Huxley) 'বৈজ্ঞানিক মানবতা' (Scientific Humanism) বিশেষ স্মরণীয়: "... man's place in the nature is that he is willy-nilly engaged in a gigantic evolutionary experiment by which life may attain to new levels of achievement and experience. Without the impersonal guidance and the efficient control provided by Science, civilization will either stagnate or collapse, and human nature cannot make progress towards realizing its possible evolutionary destinity."[১২] সাহিত্যিক গোপাল হালদার 'সমাজ সংস্কারের আবহাওয়া ও বিদ্যাসাগর' প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উল্লেখ করেছেন: "বিদ্যাসাগর শিক্ষানীতির সম্পর্কে আভাসে যা উল্লেখ করেছেন তা আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতার মাপকাঠি। যুগধর্মের তাই মূল বুনিয়াদ—বিজ্ঞানসম্মত মানববিদ্যা (Scientific Humanism)। বিদ্যাসাগরের আমলে কথাটা চলিত হয়নি, কিন্তু বিদ্যাসাগরের চিন্তায় ও কর্মে তা অনুসৃত হচ্ছিল।"[১৩] কার্যত বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বিবিধ আলোচনা হলেও তাঁর চিন্তা-চেতনার মূল ক্ষেত্র জুড়ে যে 'বিজ্ঞানমনস্কতা' বা 'সাইন্টিফিক হিউম্যানিজম'-এর বিস্তার সে প্রসঙ্গে আলোচনার অবকাশ রয়ে গেছে। তাঁর জীবনে বিজ্ঞানমনস্কতা কার্যকরী শক্তি এবং এই শক্তির যুক্তি ও নিষ্ঠার আপসহীন দার্ঢ্যে তিনি জীবনের সত্যকেই ধ্রুবতারা বলে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন. তাই বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমানস আলোচনা আজকের দিনে খুবই জরুরী। কারণ এই আলোচনার মধ্যেই নিহিত আছে সেই পুরুষকারের ভিত ও উপরি কাঠামো।

২

বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশনায় বিদ্যাসাগর

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে এক অবিস্মরণীয় নাম। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার সরস ও সাবলীল বর্ণনায় তাঁর লেখনী উজ্জ্বল। আমরা পর্যায়ক্রমে তাঁর চর্চার অন্তর্গত বিজ্ঞানের বিবিধ তথ্যের এক সংক্ষিপ্ত চালচিত্র রচনার চেষ্টা করব যেখানে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার কথা ব্যক্ত।

গণিত

গণিততত্ত্বের জটিলতা তাঁর লেখনীতে যেমন সবল তেমনই সরস: "অন্তিম অঙ্ককে শূন্য (০) বলে।... অন্য নয়টি অঙ্কের আশ্রয় ব্যতিরেকে, কেবল উহা দ্বারা কোনও সংখ্যার বোধ হয় না। কিন্তু এই ১... অঙ্কের পর (শূন্য) বসাইলে অর্থাৎ এই রূপে ১০ লিখিলে দশ হয়; ১ লিখিয়া তিনটি শূন্য বসাইলে (১০০০) সহস্র বুঝায়। .... ১, ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি অঙ্ককে বিসম অঙ্ক বলে, আর ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি অঙ্ককে সম অঙ্ক বলে।"[১] তিনি গাণিতিক সংখ্যার অভিব্যক্তিগত ভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অপূরণবাচক ও পূরণবাচক শব্দের পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন: "১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি অঙ্ক যেমন এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ ইত্যাদি সংখ্যাবাচক হয়, সেইরূপ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি পূরণের বাচক হইয়া থাকে। যাহা দ্বারা কোনও সংখ্যা পূর্ণ হয় তাহাকে ঐ সংখ্যার পূরণ বলে। যে অঙ্ক দ্বারা সেই সংখ্যার পূরণ হয়, তাহাকে পূরণবাচক বলে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি পূরণবাচক শব্দ।"[২] এই গাণিতিক অবতারণার দ্বারা বিদ্যাসাগর শিশু-পাঠকের মনে তিন (৩) এবং তৃতীয় (৩)— এই দুই বক্তব্যের পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি জানালেন, "যদি কেহ এরূপ লিখে, 'আমি চৈত্র মাসের ৩-দিবসে এই কর্ম করিয়াছিলাম," —- তাহা হইলে তিন দিবসে অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে, ইহা নিশ্চিত বুঝা যাইবে না, কেহ এরূপ বুঝিবে, ঐ কর্ম করিতে তিন দিবস লাগিয়াছিল, কেহ বোধ করিবে, মাসের তৃতীয় দিবসে ঐ কর্ম করা হইয়াছিল। ফলতঃ, যে লিখিয়াছিল, তাহার অভিপ্রায় কি, ইহার নির্ণয়

হওয়া কঠিন। কিন্তু ৩—এই অঙ্কের পর যদি 'য়' এই অক্ষর যোগ থাকে, তবে আর কোনও সংশয় থাকে না, কেবল তৃতীয় বুঝাইবে।"[৩]

পদার্থবিদ্যা

পদার্থ বিজ্ঞানের প্রথম পাঠই হল বস্তুর আকার ও পরিমাণ পরিচিতি। বিদ্যাসাগর যে প্রত্যয়েও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, "সকল বস্তুরই দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ—এই তিন গুণ আছে।"[৫] বস্তুর ওজন সম্বন্ধে তিনি জানালেন, "সমান সমান আকারের এক খণ্ড কাষ্ঠ অপেক্ষা এক খণ্ঠ লৌহ অধিক ভারী। অনেক বস্তু ওজনে বিক্রীত হয়। বস্তুর ভারের পরিমাণকে ওজন কহে।" পদার্থ বিজ্ঞানে 'আলোর প্রকৃতি' ও 'আলোর বিচ্ছুরণ' এক বিশেষ অধ্যায়। বিদ্যাসাগরের লেখনীতে আলোক বিজ্ঞানের সেই কৌতূহলী ঘটনার বিশ্লেষণ স্বল্প হলেও অত্যন্ত সরস হয়ে পরিবেশিত হয়েছে: "কৃষ্ণ, সচরাচর বর্ণ বলিয়া পরিবেশিত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণ বর্ণ নহে, অমুক বস্তু কৃষ্ণ, ইহা বলিলে সেই বস্তুতে সর্ব বর্ণের অসদ্ভাব, অর্থাৎ কোন বর্ণ নাই ইহাই প্রতীয়মান হইবে। শুক্ল বর্ণ সকল প্রকার মূল বর্ণই বিদ্যমান থাকে। মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের রশ্মি শ্বেতবর্ণ। এই রশ্মি... কোন কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া যাইলে, বাহির হওয়ার পর আর শুক্লবর্ণ থাকে না। তখন এই রশ্মিকে শুভ্রবস্ত্রের উপর ধরিলে, লোহিত, পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধূমল ও ভায়োলেট (লাল, আকাশী, হলুদ, সবুজ, নীল, কমলা, বেগুনী)—এই সাতটি বর্ণ পরপর দেখিতে পাওয়া যায়।"[৫] এই বিশ্লেষণের সঙ্গে বিদ্যাসাগর কৌতূহলী শিশু-পাঠককে আলোক বিচ্ছুরণ-উপভোগ্য প্রাকৃতিক ঘটনা যথা রামধনুর উদাহরণ দিতে ভোলেন নি।

রসায়ন

রসায়ন বিজ্ঞানের কথাও তাঁর রচনায় ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গেই বিরাজমান। সেখানে তিনি একাধিক বস্তুর আকৃতি, বিস্তার ও ব্যবস্থার দক্ষ রসায়নবিদের ন্যায় বিবৃত করেছেন। ব্যাখ্যা করেছেন কাচের উদ্ভাবন কৌশল। সেই সঙ্গে তুলে ধরেছেন মানবসভ্যতার সঙ্গে রসায়নের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা। তাঁর ভাষায় "আমরা সর্বদা যে সকল বস্তু ব্যবহার করি, উহাদের অধিকাংশই ধাতু। ধাতুর ভার অধিক.... অধিকাংশ ধাতু কঠিন... আগুনে গলানো যায়। (আবার) গলাইলে স্বর্ণের ভার কমিয়া যায় না ও ব্যত্যয় হয় না। পারদ আর আর ধাতুর মত কঠিন নহে, জলের ন্যায় তরল, যাবতীয় তরল দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ভারী, সর্বদা দ্রব অবস্থায় থাকে। কিন্তু মেরু সন্নিহিত দেশে লইয়া গেলে জমিয়া যায়। স্পর্শ করিলে, পারদ স্বভাবতঃ সমস্ত দ্রব্য অপেক্ষা শীতল কিন্তু অগ্নির উত্তাপ দিলে, সহজে উষ্ণ হইয়া ওঠে।"[৬] তিনি কেবল ধাতুর প্রকৃতি বিবৃত করেই ক্ষান্ত ছিলেন না—বোধোদয়ের সংক্ষিপ্ত

রচনায় তিনি ধাতুসমূহের ব্যবহারের পরিবৃত্তিও উপহার দিয়েছেন : "সীসেতে পেনসিল প্রস্তুত হয় ; ... গোলা গুলি নির্মিত হয় ;.. তাম্র হতে পয়সা প্রস্তুত হয়.... লৌহ হতে ছুরি কাঁচি, কাটারি, চাবি প্রভৃতি নির্মিত হয়ে থাকে... রাঙ (রঙ্গ) ধাতুতে বাক্স, পেটরা, কৌটা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য নির্মিত হয়।"[৭] এখানেই শেষ নয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ রচনায় বহু সংকর ধাতুর নমুনাও উপস্থাপন করেছেন, "তিন ভাগ দস্তা ও চারি ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, পিতল হয় ; ... দুই ভাগ রাঙ ও সাত ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে, উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়।"[৮]

কেবল ধাতব পদার্থই নয়, হীরক ও কাচের ন্যায় অধাতব পদার্থের বিবরণও তাঁর রচনায় বিদ্যমান। হীরক প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, "যত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রস্তর আছে, হীরক জ্যোতি সর্বাপেক্ষা অধিক। ... এ পর্যন্ত যত বস্তু জানা গিয়াছে, হীরা সকল অপেক্ষা কঠিন ;.. ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, এই মহামূল্য প্রস্তর ও কয়লা, দুই-ই এক পদার্থ। কিছু দিন হইল, দে প্রেয়ঁ নামক এক ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত অনেক যত্ন, পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর কয়লাতে হীরা প্রস্তুত করিয়াছে।"

কাচ প্রস্তুতিতে উহাতে "বালুকা ও একপ্রকার ক্ষার, এই দুই বস্তু একত্রিত করিয়া অগ্নির প্রকট উত্তাপ লাগাইলে, গলিয়া উভয়ে মিলিয়া কাচ হয়। কাচ অনেক প্রয়োজনে লাগে — সার্সি, আরসি, সিসি, বোতল প্রভৃতি নানা বস্তু কাঁচে প্রস্তুত হয়।"[১০]

ভূ-বিজ্ঞান

বিদ্যাসাগরের বর্ণনায় ভূ-বিজ্ঞানও বিধৃত : "পৃথিবীর অধিকাংশ জলে মগ্ন.. যে জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া আছে, তাহার নাম সমুদ্র। যথানিয়মে প্রতিদিন সমুদ্রের জলের যে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, উহাকে জোয়ার ও ভাটা বলে। সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে এই অদ্ভুত ঘটনা হয়.... সমস্ত প্রধান প্রধান নদীর জল সমুদ্রে পড়ে.... কিন্তু তাহাতে সমুদ্রের জলের বৃদ্ধি হয় না। কারণ নদীপাত দ্বারা সমুদ্রের যত জল বাড়ে, ঐ পরিমাণে সমুদ্রের জল, সর্বদা কুজঝবটিকাও বাষ্প হইয়া আকাশে ওঠে, ঐ সমস্ত বাষ্পে মেঘ হয়, মেঘ সকল, যথাকালে, জল হইয়া ভূতলে পতিত হয়। সেই জল দ্বারা পুনরায় নদী প্রবাহের বৃদ্ধি হয়।"[১১]

সময়কালের বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের সংমিশ্রণে তিনি ভূগোলতত্ত্বের নীরস এক অধ্যায়কে অত্যন্ত সহজবোধ্য করে তুলেছেন, "দিবা ও রাত্রি এ দুয়ে এক দিবস হয়, অর্থাৎ এক প্রভাত হইতে আর এক প্রভাত পর্যন্ত যে সময়, তাহাকে দিবস বলে। দিবসকে ষাট ভাগ করিলে, ঐ এক-এক ভাগকে এক-এক দণ্ড বলে। আড়াই দণ্ডে এক হোরা বা ঘণ্টা ; তিন ঘণ্টাতে অর্থাৎ সাড়ে সাত দণ্ডে এক প্রহর, আট প্রহরে এক দিবস ; পনের দিবসে এক পক্ষ হয়।

দুই পক্ষ—শুক্ল ও কৃষ্ণ। যে পক্ষে চন্দ্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাকে শুক্ল পক্ষ বলে। আর যে পক্ষে চন্দ্রের হ্রাস হইতে থাকে তাহাকে কৃষ্ণ পক্ষ বলে। দুই পক্ষে অর্থাৎ ত্রিশ দিনে এক মাস হয়। দুই মাসে এক ঋতু। সমুদয়ে ছয় ঋতু এই—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। ছয় ঋতুতে অর্থাৎ বার মাসে এক বৎসর হয়।"[১২] অতঃপর বিদ্যাসাগর বৎসর গণনার ঐতিহাসিক ধারার নিয়মরীতি অবগত করিয়েছেন, "কোনও সুপ্রসিদ্ধ রাজার অধিকার, অথবা কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া, বৎসরের গণনা আরব্ধ করা হইয়া থাকে। এইরূপে যে বৎসরের গণনা করা যায়, তাহাকে শাক বলে। আমাদের দেশে তিন শাক প্রচলিত, সংবৎ, শকাব্দাঃ ও সাল। বিক্রমাদিত্য নামে এক অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তিনি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সংবৎ। আর শালিবাহন রাজা যে শাক প্রচলিত করেন, তাহার নাম শকাব্দাঃ। ... মুসলমানেরা মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের দিবস অবধি, এক শাকের গণনা করেন, উহার নাম 'হিজিরা'। ভারতবর্ষের মোগল সম্রাট আকবর, হিজিরা নামের পরিবর্তে ঐ শাককেই 'ইলাহী' নামে প্রতিষ্ঠা করেন। উহাই বাংলাদেশে সাল নামে প্রচলিত হইয়াছে।"[১৩]

উদ্ভিদবিদ্যা

বিদ্যাসাগরের উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ধারণা আমাদের বিস্মৃত করে। তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণে আমরা যেমন দেখি উদ্ভিদদের গাঠনিক বৈচিত্র্যের কথা তেমনি সেখানে আছে উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার বহু জটিল বিষয়ের সরল উপস্থাপনা। উদ্ভিদের গঠন বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, "যে সকল বস্তু ভূমিতে জন্মে উহাদিগকে উদ্ভিদ বলে, যেমন লতা, তৃণ, বৃক্ষ ইত্যাদি, উহারা সচরাচর ভূমি ভেদ করিয়া ওঠে, এজন্য উহাদিগকে উদ্ভিদ বলে।... একদিকে যেরূপ বৃহদাকার বৃক্ষ আছে, অপরদিকে সেরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি উদ্ভিদও দেখিতে পাওয়া যায়। ছত্রক বা কোঁড়ক জাতীয় কোন কোনও উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ষাকালে পুস্তকে যে ছাতা পড়ে তাহা এই জাতীয় উদ্ভিদ।"[১৪]

উদ্ভিদবিজ্ঞানে উদ্ভিদদেহে লবণ ও জল সম্মিলনে গঠিত 'রস' (Sap) এর সঞ্চালনকে রসের উৎস্রোত (Ascent of sap) নামে এবং শীতকালে উদ্ভিদ জটিল কলা ফ্লোয়েমের সীভ্‌চাকতিতে ক্যালোজ নামক শর্করা সঞ্চয়নজনিত ক্যালাসপ্যাড গঠন ও খাদ্য সংবহন অস্থায়ী রহিত হওয়ার কথা বিবৃত আছে[১৫] ; এই ক্যালাসপ্যাড গঠন হওয়ায় পর্ণমোচী উদ্ভিদকুল শীতকালে পাতার মোচন ঘটায়, বসন্তকালে পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়লে ঐ ক্যালোজ প্যাড গলে যায় তখন খাদ্য সংবহন সর্বত্র স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে এবং উদ্ভিদ দেহে কিশলয় উদগম শুরু হয়। উল্লিখিত উদ্ভিদ শারীরবৃত্তীয় কৌশল বিদ্যাসাগর শিশু পাঠ উপযোগী পরিবেশন

করলেন, "উদ্ভিদসকল, মূল দ্বারা ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করে। ঐ আকৃষ্ট রসই উদ্ভিদের খাদ্য। রস মূল হইতে স্কন্ধদেশে ওঠে। তৎপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত শাখা প্রশাখা ও পত্রে প্রবেশ করে। এইরূপে ভূমির রস উদ্ভিদের সর্ব অবয়বে সঞ্চারিত হয়।... শীতকালে রসের সঞ্চার রুদ্ধ হয়, এজন্য পত্রসকল শুষ্ক ও পতিত হয়। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, পুনর্বার রসের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়; তখন নূতন পত্র নির্গত হইতে থাকে।"[১৬] তিনি এখানেই থামলেন না, মানবসভ্যতার সঙ্গে উদ্ভিদের যে আত্মিক সম্পর্ক তাকে চিত্রিত করলেন অত্যন্ত সহজ আঙ্গিকে : "উদ্ভিদ মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপায়। আমরা কি অন্ন, কি বস্ত্র, কি বাসগৃহ সমুদয়ই উদ্ভিদ হইতে লাভ করি।... অসুখের সময় রোগীকে যে এরোরুট পথ্য দেওয়া হয়, তাহা হরিদ্রা জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের মূল হইতে উৎপন্ন,... অনেকে প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে চা খাইয়া থাকেন— ঐ চা একপ্রকার গুল্মের শুষ্ক পত্র। কাগজ হইতে পেনসিল বা কালির দাগ উঠাইবার যে রবার ব্যবহৃত হয় তাহা বটগাছের ন্যায় এক প্রকার বৃহৎ গাছের আঠা মাত্র।"[১৭]

প্রাণিবিজ্ঞান

প্রাণিবিজ্ঞান সংক্রান্ত তাঁর রচনাগুলি যেমন তথ্যবহুল তেমনই রসোত্তীর্ণ। তাঁর কথামালা গ্রন্থে অসংখ্য প্রাণীর নাম পাওয়া যায় এবং ঐ গ্রন্থে বর্ণিত গল্পের আখ্যান ভাগে প্রাণী প্রকৃতিই চিত্রিত। 'কথামালা' গ্রন্থের গল্পে উপস্থিত প্রাণীসমূহের মধ্যে সন্ধীপদ প্রাণী (শতকরা ৩.০৯), উভচর শ্রেণী (শতকরা ১.০৩), সরীসৃপ শ্রেণী (শতকরা ৩.০৯) এবং পক্ষী শ্রেণী (শতকরা ১৫.৪৬) এবং স্তন্যপায়ী শ্রেণীর (শতকরা ৭৭.৩৩) প্রাণীর উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। সন্ধীপদী প্রাণীর মধ্যে মাছি, মশা ও পিপীলিকার নাম পাওয়া যায়, উভচর শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর মধ্যে ভেকের (ব্যাঙ) নাম, সরীসৃপ গোষ্ঠীর সর্প ও কচ্ছপের নাম, পক্ষীশ্রেণীর কাক, বক, সারস, ঈগল, মোরগ, শকুন, পায়রা ও চিলের নাম এবং স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী বানর, বাঘ, সিংহ ও ভল্লুক, কুকুর, শৃগাল, ইঁদুর, খরগোস, ষাঁড়, মহিষ, ছাগল, মেষ, হরিণ, ঘোড়া ও গাধার নাম পাওয়া যায়।

তাঁর 'বধোদয়' পুস্তকে বর্ণিত প্রাণী পরিচিতির মধ্যে বিস্ময়কর তথ্যের সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়; সেখানে তিনি প্রাণীদের বিন্যাসবিধি, আচরণ বৈচিত্র্য ও অভিযোজনের কথা উল্লেখ করেছেন। এই সমস্ত বিষয়ই প্রাণিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাসগত পরিচয়ে তিনি জানিয়েছেন, "অনেক জন্তু আছে, "তাহারা এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ নামক যন্ত্র ব্যতিরেকে, কেবল চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না।... পতঙ্গ একপ্রকার জন্তু... ফড়িং, মশা, মাছি প্রজাপতি প্রভৃতি বহুবিধ পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়। মৎস্য জলে থাকে তাহাদের দেহ মসৃণ চিক্কন

শঙ্ক আছে। আর একপ্রকার জন্তু আছে, তাহাদিগকে সরীসৃপ বলে, যেমন সাপ, গোসাপ, টিকটিকি, গিরগিটি ইত্যাদি। সর্প সরীসৃপের পা নাই, বুকে ভর দিয়া চলে।... জন্তুর মধ্যে পক্ষীজাতি দেখিতে সুন্দর... তাদের সর্বাঙ্গ পালকে ঢাকা... পক্ষীর দুই পাশে দুই পক্ষ অর্থাৎ ডানা আছে, উহা দ্বারা উড়িতে পারে। যে সকল জন্তুর (স্তন্যপায়ী) শরীরে চর্ম রোমশ, অর্থাৎ রোমে আবৃত, এবং যাহারা চারি পায়ে চলে তাহাদিগকে পশু বলে; যেমন—গো, মহিষ, অশ্ব, গর্দভ, ছাগল, মেষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি।"[১৮] শ্রেণীবিন্যাস-বিধি প্রাণিবিজ্ঞানের ব্যাকরণতুল্য[১৯] কারণ এই নীতির ভিত্তিতেই প্রাণীসমূহের সনাক্তকরণ এবং নামকরণ ঘটে। এই তত্ত্ব মাথায় রেখেই বিদ্যাসাগর আমাদের জানালেন, "কোন্ জন্তু কোন্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট, কাহার কি নাম, বিশেষরূপে জানা অতি আবশ্যক। কোনও জন্তুকেই অযথা নামে ডাকা উচিত নহে, যাহার যে নাম, তাহাকে সেই নামে ডাকা কর্তব্য। কোনও কোনও ব্যক্তি বাদুড়কে পক্ষী বলে, কিন্তু বাদুড় পক্ষী নহে, স্তন্যপায়ী। পশুদিগের ন্যায় উহাদিগের চারি পা আছে। সম্মুখের দুই পায়ের অঙ্গুলি শরীরের অপেক্ষা অনেক বৃহৎ এবং একখানি পাতলা চর্ম দ্বারা পরস্পরযুক্ত। উহাকেই আমরা বাদুড়ের ডানা বলি।"[২০]

প্রাণীসমূহের অভিযোজন প্রবণতা তাঁর কথায় ব্যক্ত, "পৃথিবীর সকল স্থানেই নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জন্তু আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থলচর, অর্থাৎ কেবল স্থলে থাকে, আর কতকগুলি জলচর, অর্থাৎ কেবল জলে থাকে, আর কতকগুলি স্থল ও জল উভয় স্থানেই থাকে, উহাদিগকে উভচর বলা যাইতে পারে।

বোধোদয়ের 'ইতরজন্তু' অধ্যায়ে বিদ্যাসাগর প্রাণিজগতের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্কের এক চরম চালচিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন— অধুনা যা 'অর্থনৈতিক প্রাণিবিদ্যা' নামে চিহ্নিত হবার দাবী রাখে। তাঁর লেখনী অনুসরণে জ্ঞাত হওয়া যায়: "গরুর মত মনুষ্যের উপকারী জীব পৃথিবীতে আর নাই। দুগ্ধে শরীরের পুষ্টি সাধন হয় এবং ক্ষীর, দধি, ছানা, নবনীত প্রভৃতি নানা উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়, চর্মে পাদুকা নির্মিত হয়.. অস্থিতে ছুরির বাঁট গড়ে... গোময় হইতে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইয়া থাকে।.. তিব্বত দেশের ছাগলের লোমে শাল হয়... হিমালয় প্রদেশের চামরী জন্তু লাঙ্গুলের লোমে চামর প্রস্তুত হয়... সমুদ্রের তলদেশের ঝিনুক বালুকণার ন্যায় কোনও ক্ষুদ্র কঠিন বস্তু প্রবেশ করাইয়া তৎপ্রদেশ হইতে রস নির্গত করিয়া থাকে, পরে ঐ রস জমিয়া শুভ্র, মসৃণ, উজ্জ্বল, কঠিন পদার্থে পরিণত করে। এই পদার্থের নাম মুক্তা। তুঁত, আসন প্রভৃতি গাছের পাতায় গুটি পোকা অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে। পোকা হইতে পতঙ্গের অবস্থায় আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্বে, উহাদের মুখ হইতে সূক্ষ্ম সূত্রের মত লালা নিঃসৃত হইয়া থাকে, এবং বায়ুর সংযোগে অবিলম্বেই দৃঢ় হইয়া যায়। এই সূক্ষ্ম সূত্রের নাম রেশম।... লাক্ষা বা গালা কীটজ পদার্থ; অশ্বত্থ, ডুমুর, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের বল্কলে এক

প্রকার কীপ্র (কীট) দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ কীটের অঙ্গ হইতে যে লোহিত বর্ণ পদার্থ ক্ষরিত হয়, তাহারই নাম লাক্ষা। মধু মক্ষিকা দ্বারা মনুষ্যের বহু উপকার সাধিত হয়। মৌমাছির বাসগৃহের নাম মধুচক্র বা মৌচাক... বসন্তকালে যখন নানাবিধ ফুল ফোটে, তখন মৌমাছিরা ঐ সকল ফুল হইতে যত্নে মধু আহরণ করিয়া, মধুচক্রে আনিয়া রাখে। চাক ভাঙ্গিলেই সেই মধু সংগ্রহ করা যায়।... মৌচাক গলাইলে, মোম প্রস্তুত হয়।"[২৩]

শারীরবিজ্ঞান

তাঁর বিবরণে মানব শারীরবিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়তন্ত্রের পরিচয় বিধৃত হয়েছে: "ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ; মনুষ্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। চক্ষু দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে দর্শন বলে; কর্ণ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে শ্রবণ; নাসিকা দ্বারা যে জ্ঞান তাহাকে আঘ্রাণ; জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন; ত্বক দ্বারা জ্ঞানকে স্পর্শ বলে।"[২৪] কেবল অঙ্গের উল্লেখও তার মুখ্য উদ্দেশ্য বলেই তিনি স্তব্ধ থাকেন নি। ঐ সমস্ত অঙ্গের সম্ভাব্য শারীরবৃত্তীয় কৌশলকে বিবৃত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। চক্ষুর ক্রিয়া প্রসঙ্গে বলেছেন: "অক্ষি গোলকের সম্মুখভাগে যে গোলাকৃতি অংশ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, ঐ অংশকে চক্ষুর তারা বলে। উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। তারার পশ্চাদ্ভাগে একটি কোমল পাতলা পর্দা থাকে। আমরা যে বস্তু দেখি, সে বস্তু হইতে আলোক আসিয়া, তারা ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তখন ঐ কোমল পাতলা পর্দার উপর সেই বস্তুর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি আবির্ভূত হয়, তাহাতেই আমাদের দর্শন জ্ঞান জন্মে।"[২৫] কর্ণ প্রসঙ্গে জানালেন, "শব্দ প্রথমে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কর্ণকুহরে, পটহের মত যে অতি পাতলা একখণ্ড চর্ম আছে, তাহাতে ঐ সকল শব্দের প্রতিঘাত হয়, এবং তাহাতেই শ্রবণজ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।"[২৬] নাসিকার কথায় আছে, "নাসিকা রন্ধ্রের অভ্যন্তরে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সঞ্চারিত আছে। ঐ সকল স্নায়ু দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়।"[২৭] জিহ্বা প্রসঙ্গে জানালেন, "জিহ্বাতে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে, মুখের ভিতর কোন বস্তু দিলে, ঐ সকল স্নায়ুর দ্বারা তাহার স্বাদ হয়।"[২৮] ত্বকের কথায় জানা যায়, "ত্বক সকল শরীর ব্যাপিয়া আছে, এবং সমস্ত ত্বকেই স্নায়ু সঞ্চারিত আছে; এজন্য শরীরের সকল অংশই স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে।"[২৯] আরো বিস্মৃত হতে হয় যখন দেখি তিনি মানব ইন্দ্রিয়তন্ত্রের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর ইন্দ্রিয়তন্ত্রের এক তুলনামূলক আলোচনা নিবদ্ধ করেছেন, "মানুষের ন্যায় ইতর জন্তুরও ইন্দ্রিয় আছে, বিড়ালের শ্রবণশক্তি অনেক অধিক; এরূপ হইবার তাৎপর্য এই যে, বিড়ালের শ্রবণশক্তি অধিক না হইলে, অন্ধকারময় স্থানে মূষিক প্রভৃতির সঞ্চার বুঝিতে পারিত না। কোন কোনও কুকুর জাতির ঘ্রাণশক্তি অতিশয় প্রবল; পলায়িত পশুর গাত্রগন্ধের আঘ্রাণ অনুসারে, আহার অন্বেষণ না করিলে তাহারা সহজে শিকার করিতে পারিত না।"[৩০]

কৃষিবিজ্ঞান

বৈজ্ঞান সম্পর্কিত তাঁর অভিজ্ঞানও আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না। 'কৃষিকর্ম' শিরোনামী বিবরণে তিনি যেমন কৃষিকর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন, তেমনি পরবর্তী আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষিকার্যের পরিধি, তার ক্ষেত্র, পরিচর্যাবিধি, সতর্কীকরণ ও পরিশেষে এদেশে কৃষিকর্মের সম্ভাবনার এক তথ্যানুসন্ধী কৃষি-গবেষকের ন্যায় পরিবেশন করেছেন। সেই কালে এ জাতীয় প্রত্যয় ও তার বহিঃপ্রকাশ নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের দাবী রাখে।

তিনি জানিয়েছেন যে, কৃষিকর্ম হল ভূমি খনন, বীজ বপন, গাছ জন্মিলে তার সুরক্ষা, ফলযুক্ত গাছের সংগ্রহ ও গাছ থেকে ফলের পৃথকীকরণের সম্মিলিত ক্রিয়া।

কৃষি পরিমণ্ডল ও মানুষের সম্পর্কের এক মনোজ্ঞ বিবরণ সংক্ষেপে উপস্থিত করে বিস্ময়কর চমৎকারিত্বের সৃজন ঘটিয়েছেন, "আমরা প্রতিদিন যাহা খাই, তাহার অধিকাংশ কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন, ধান্য হইতে তণ্ডুল, যব হইতে ছাতু, গম হইতে ময়দা, সর্ষপ হইতে তৈল, ইক্ষু হইতে চিনি, শাক, পটোল, আলু তরমুজ ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী ও কৃষিকর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়।"[৩১]

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে ব্যক্তিজীবনে বিজ্ঞানী না হয়েও তিনি কৃষিকর্মের আবশ্যকীয়। প্রত্যয়কে কী নৈপুণ্যের সঙ্গে ধারণ করতে পেরেছিলেন, এবং সেই কারণেই কৃষিবিজ্ঞানের এ প্রত্যয় তাঁর লেখনী থেকে নিঃসৃত হতে পেরেছিল: "জন্তুসকল যেরূপ প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, উদ্ভিদগণও সেইরূপ করিয়া থাকে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে না পারিলে যেমন আমাদের রোগ হয়। তেমনই উদ্ভিদগণেরও অপকার হয়। এজন্য বৃক্ষাদি ঘন করিয়া রোপিলে, উহারা রীতিমত বাড়িতে পারে না, (স্মরণ রাখা দরকার) সূর্যের আলোক ও উত্তাপ মনুষ্যের যে পরিমাণে আবশ্যক, উদ্ভিদের তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয়।"[৩২]

উদ্ভিদের প্রযত্ন বিষয়ে জানালেন, "কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ উদ্ভিদের খাদ্য যথেষ্ট আছে, ইহা বুঝিয়া চাষ করিতে পারিলে, অধিক ফললাভ হয়। এক ভূমিতে বারংবার একই শস্যের চাষ করিলে ক্রমে শস্যের যে খাদ্য তাহা ফুরাইয়া যায়। তখন আর সে জমিতে ঐ শস্যের চাষ না করিয়া, অপর কোনও শস্যের চাষ করা বিধেয়।

কোনও ভূমিকে শস্য বিশেষের উপযোগী করিতে হইলে, তাহাতে সার দিতে হয়। পচা, গোবর, পচাপাতা, খইল ইত্যাদি ভূমির উত্তম সার। বিলাতের ভূমি বঙ্গদেশের ভূমি অপেক্ষা কোন ক্রমে উর্বরা নহে, অথচ সার দিবার পারিপাট্যে অনেক অধিক শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে।"[৩৩]

এদেশের কৃষি উন্নতির গৌরবময় সম্ভাবনার প্রতিও তাঁর বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। সংশ্লিষ্ট বক্তব্যে তিনি জানালেন, "আমাদের দেশে ভূমিকে লক্ষ্মী বলে। সুনিয়মে

চাষ করিতে পারিলে, অল্পদিনের মধ্যেই লোকে ধনবান হইতে পারে। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ বিভাগে এক ব্যক্তি কয়েক বিঘা ভূমিতে কেবল নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিয়া দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিল। যশোর জিলায় একস্থান বহুকাল পতিত ছিল। সেখানে কেবল দু একটি খর্জুর বৃক্ষ ভিন্ন, অপর কোনও বৃক্ষ সতেজে জন্মিত না। ইহা দেখিয়া এক সাহেব, ঐ ভূমি খর্জুর বৃক্ষের উপযোগী বুঝিতে পারিয়া উহাতে বহু সংখ্যক খর্জুর বৃক্ষ রোপণ করেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়া, স্বদেশে গমন করেন।”[৩৪]

৩

বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের চরিত্রচিত্রণ

সমকালীন ভারতবর্ষের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার দূর করে সেখানে বিজ্ঞানের আলোককে অনুপ্রবেশ ঘটানোয় বিদ্যাসাগরের নিষ্ঠা ও পরিশ্রম আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না। কেবল বৈজ্ঞানিক তথ্যের বৈচিত্র্যকে দেশীয় ভাষায় প্রকাশ ও প্রচার ঘটিয়ে তিনি তাঁর উদ্যোগকে সংহত করেননি; তিনি চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে লোকের চেতনাভূত করতে। আর সেই মহৎ প্রয়াসকে সামনে রেখেই তিনি চাইলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের মহান জীবনাদর্শ বঙ্গীয় পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরতে। তিনি রচনা করলেন 'চরিতাবলী' ও 'জীবনচরিত' গ্রন্থদ্বয়।

তাঁর রচনায় জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকস ও উইলিয়ম হর্শেলের জীবনী বিবৃত। উল্লিখিত বিজ্ঞানীদের জীবনী বর্ণনা প্রাক্কালে তিনি সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটের চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং সেইসঙ্গে আমাদের জ্ঞাত করিয়েছেন মানুষের সংস্কারলব্ধ অজ্ঞতা ও বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ সঞ্জাত প্রত্যয়ের নির্মম প্রতিক্রিয়ার কথা।

পূর্বকালীন পণ্ডিতদের বিশ্বাস ছিল পৃথিবী স্থির আর সূর্যই তাকে প্রদক্ষিণ করছে; কিন্তু কোপারনিকাস তাঁর পর্যবেক্ষণ ও প্রজ্ঞায় ঐ সিদ্ধান্তকে ভুল বলে ঘোষণা করেন; কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে তিনি বিজ্ঞানের এই সত্যকে সহজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছিল। এই বিজ্ঞানীর সেই প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর জানালেন, "পূর্বকালীন লোকেরা বিচারের সময় চিরাগত কতিপয় নির্ধারিত নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন; সুতরাং স্বয়ং তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারিতেন না, এবং অন্যে সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেও, তাহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। তৎকালীন লোকদিগের এই রীতি ছিল, পূর্বাচার্যেরা যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, কোনও বিষয়, তাহার বিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধবৎ আভাসমান হইলে, তাঁহারা শুনিতে চাহিতেন না। বস্তুতঃ, তাঁহারা কেবল প্রমাণ প্রয়োগেরই বিধেয় ছিলেন, তত্ত্বনির্ণয় নিমিত্ত স্বয়ং অনুধ্যান বা বিবেচনা করিতেন না। ইহাতে এই ফল জন্মিয়াছিল; নির্মল মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা অভিজ্ঞতা বা অনুসন্ধান দ্বারা যে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাসিত করিতেন তাহা, চিরসেবিত মতের বিসংবাদী বলিয়া, অবজ্ঞারূপ অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইত।"[১]

জ্যোতির্বিদ হর্শেল 'ইউরেনাস' গ্রহের আবিষ্কারক। এই মহান জ্যোতির্বিদের জীবনী আলোচনার ভূমিকায় বিদ্যাসাগর সমকালীন পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদদের এক তালিকা দিয়েছেন — তার ইতিহাস-মূল্যও নগণ্য নয়। সেই লেখনী থেকে অবগত হওয়া যায়, "কোপার্নিকসের সময়াবধি টাইকো, ব্রেহি, কেপ্লর, হিগিন্স, নিউটন, হেলি, ভিলাইল, লেলন্ড ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদবর্গের প্রযত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা জ্যোতির্বিদ্যার ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইয়া আসিতেছিল। পরে, যে চিরস্মরণীয় মহানুভবের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা উক্ত বিদ্যার এক কালে ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়, তিনিই স্যর উইলিয়ম হর্সেল।"[২] এই বিজ্ঞানীর নিষ্ঠার এক মনোরম চিত্র উপহার দিয়েছেন বিদ্যাসাগর পাঠকদের : "এই প্রধান জ্যোতির্বিদ স্বাভিলাষিত আলোচনা বিষয়ে এমন অনুরক্ত ছিলেন যে, অনেক বৎসর পর্যন্ত নক্ষত্র দর্শনযোগ্য কালে কখনও শয্যারূঢ় থাকিলেন না ; কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতে নিজ উদ্যানে অনাবৃত প্রদেশে প্রায় একাকী অবস্থিত হইয়া সমুদয় পর্যবেক্ষণ সমাধান করেন। তিনি এই সমস্ত গবেষণা দ্বারা দূরতরবর্ত্তী নক্ষত্রসমূহের ভাব অবগত হইয়া, তদ্বিষয়ের বিবরণ স্বাভিপ্রায় সহিত পত্রারূঢ় করিয়া প্রচার করেন।"[৩]

পদার্থবিদ্ গ্যালিলিও ও নিউটনের সংগ্রামমুখর জীবনী সার্থক বাণীমূর্তি লাভ করেছে তাঁর লেখনীতে। যে গ্যালিলিয় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করতে এসে হয়ে গেলেন প্রখ্যাত পদার্থবিদ্ এবং যিনি পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্বও পৃথিবীর গতি সম্পর্কিত বহু জটিল পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয়ের প্রবক্তা তাঁর সত্য কথনের জন্য তাঁকে রোমের ধর্মযাজকদের কাছে নতজানু হয়ে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, তিনি যা বলেছেন সব ভুল.....যা দেখেছেন। তাও ভুল! কিন্তু সত্য সহজে মরে না। সেই প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন বিদ্যাসাগর, "রোমনগরে উপস্থিত হইবামাত্র, ধর্মসভার অধ্যক্ষরা তাঁহাকে (গ্যালিলিওকে) কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কয়েকমাস তথায় অবস্থিতির পর বিচার কর্তাদিগের সম্মুখে নীত হইলে, তাঁহারা এই দণ্ডবিধান করিলেন, তোমাকে আমাদের সম্মুখে আঁঠু পাড়িয়া ও বায়বল স্পর্শ করিয়া কহিতে হইবেক, আমি পৃথিবীর গতি প্রভৃতি যাহা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি সে সমুদায় অস্বর্গ্য, অশ্রদ্ধেয়, ধর্ম বিদ্বিষ্ট ও ভ্রান্তিমূলক। গ্যালিলিয়, সেই বিষম সময়ে মনের দৃঢ়তা রক্ষা করতে না পারিয়া, যথোক্ত প্রকার পূর্বনির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু গাত্রোত্থান করিবামাত্র, আন্তরিক দৃঢ় প্রত্যয়ের বিপরীত কর্ম করিলেন, (মনের ঘৃণায়) তিনি পৃথিবীতে পদাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ইহা এখনও চলিতেছে। বিচারকর্তারা গ্যালিলিয়র নাস্তিক্যবুদ্ধির পুনঃসঞ্চার দেখিয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম দিলেন।"[৪]

এহেন প্রতিরোধী বিজ্ঞানীকেও কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করে অন্ধত্ব, বধিরতা, দেহপ্রদাহ নিয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। এই বৃদ্ধ বিজ্ঞানী কারাবাসেও পদার্থ বিজ্ঞান চর্চা রহিত রাখেন নি। নিজের জীবন দিয়েও বিজ্ঞানের সত্যতার প্রতিষ্ঠায় তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

বিদ্যাসাগরকৃত মহামতি নিউটনের জীবনালেখ্য শুরু হয় এই বলে যে, "গ্যালিলিয় যে বৎসর কলেবর পরিত্যাগ করেন, সেই বৎসরে আইজ্যাক নিউটনের জন্ম হয়।"[৫] এই অধ্যায়ে নিউটনের গতিতত্ত্ব ও আলোক বিচ্ছুরণ সংশ্লিষ্ট তথ্যের পরিবেশনা আছে। সর্বোপরি বিস্ময় বিষয় হল প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকের অভিমানশূন্য তার পরিচয় : "আমি (নিউটন) বালকের ন্যায়, বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সংকলন করিতেছি,—জ্ঞান মহার্নব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"[৬]

উদ্ভিদ বিজ্ঞানী লিনিয়াসের শ্রমনিপুণ জীবনী তাঁর লেখনীতে বড়ই মনোরম হয়ে উঠেছে। তিনি জানিয়েছেন — বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী মহামতি লিনিয়াস কখনো পদার্থবিদ্যা, কখনো চিকিৎসাবিদ্যায় আবার কখনো উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণায় মগ্ন। বিজ্ঞানী লিনিয়াস প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য বড়ই প্রণিধানযোগ্য : "তিনি যেরূপ অসাধারণ সাহস, উৎসাহ, পরিশ্রম ও দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমুদায় ইতিবৃত্ত মধ্যে অতি অল্পলোকের সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।"[৭] জীবনী আলোচনাক্রমে অবগত করিয়েছেন লিনিয়াসকৃত যুগান্তকারী গ্রন্থের নাম 'স্পিসিস প্লান্টেরম' যা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বেদ বলে কথিত এবং যার অস্তিত্ব আজও অম্লান।

অতঃপর শারীরবিদ্যা বিশারদ হান্টারের প্রসঙ্গ। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন হান্টারের ক্রমোত্তরণের কথা: "দেখ! হান্টার কেমন আশ্চর্য লোক। বাল্যকালে পিতা-মাতার আদরে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুই লেখাপড়া শিখেন নাই।.....উদরের অন্নের নিমিত্ত, অবশেষে, ছুতারের কর্ম করিয়াছিলেন।......ভগিনীপতির ব্যবসায়েও জড়িত ছিলেন...... অবশেষে কুড়ি বৎসর বয়সে অগ্রজের নিকটে আসিয়া লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিখ্যান ও চিরস্মরণীয় বিজ্ঞানী হইয়া গিয়াছেন।"[৮]

চিকিৎসক লীডনের জীবনীও তাঁর অনুপম লেখনীতে চিত্রিত হয়েছে। কৃষকের সন্তান লীডন কঠোর পরিশ্রমে, অন্যের কাছ থেকে পুস্তক চেয়ে এনে পড়াশুনা সম্পূর্ণ করেছিলেন। ডাক্তার লীডন ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে মনোনিবেশ করেছিলেন। চিকিৎসক লীডন অদ্ভুত পরিশ্রমে লাটিন, গ্রীক, ফারসি, জার্মান, স্পানিশ প্রভৃতি দশ রকম ভাষা শিখেছিলেন এবং ধর্মনীতি, গণিতবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেছিলোন; তাঁর বাসনা ছিল পরিণত বয়সে তিনি যেই পাদরি হবেন, যিনি ছাত্রদের কাছে কোনরূপ দক্ষিণাব্যতীত শিক্ষা বিতরণ করবেন। তাঁর অটুট অধ্যবসায় ও মনঃসংযোগের প্রতি এদেশীয় ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করার মানসে বিদ্যাসাগর লীডন-জীবনীর শেষ অনুচ্ছেদে বলেছেন, "লীডন অতি দুঃখীর সন্তান। পিতা-মাতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, তাঁহাকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখান। কিন্তু তিনি কত ভাষা ও কত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন অনুধাবন করিয়া দেখ, কেবল অসাধারণ যত্ন ও অসাধারণ পরিশ্রমের গুণেই, লীডস এই সমস্ত ভাষা ও এই সমস্ত বিদ্যা শিখিতে পারিয়াছিলেন।"[৯]

৪

চিকিৎসক বিদ্যাসাগর

চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে মানবদরদী বিদ্যাসাগরের বিস্ময়কর সম্পর্ক আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না। বলাবাহুল্য এ শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ, এই শাস্ত্র শিক্ষা এবং এ শাস্ত্রের অধীত জ্ঞান রোগগ্রস্ত মানবের ওপর প্রয়োগ—সমস্তই ঘটেছিল মানুষের কল্যাণের তাগিদে। অসহায় মানুষের বিশেষ সহায়ক হওয়ার উদ্যোগেই আমরা দয়ার সাগরকে বিশেষ চিকিৎসকরূপে দেখব।

প্রথমেই আসা যাক্ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর মনোভাব। বিহারীলাল উল্লেখ করেছন, "এই সময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতি ও প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। ইহার পূর্বে ইনি এই চিকিৎসার উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ১৮৬৬ সালে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিদ্ বেরিণী সাহেব কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। কলিকাতার বহুবাজার নিবাসী ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত বেরিণী সাহেবের বেশ সংপ্রীতি হইয়াছিল। রাজেন্দ্রবাবু ইতিপূর্বে হোমিওপ্যাথিক শিক্ষানুশীলনে কতকটা মনোযোগী হইয়াছিলেন। বেরিণী সাহেবের সহায়তায় তিনি এ বিষয়ে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। চিকিৎসাতেও তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসামতে রাজেন্দ্রবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিরঃপীড়া আরাম করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে রাজকৃষ্ণবাবু নিদারুণ মলকৃচ্ছ্রতা পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবুকে মলত্যাগ কবিবার সময় পিচকারী ব্যবহার করিতে হইত। পিচকারী ব্যবহারে কঠোর মল অতিকষ্টে নির্গত হইত, এবং তাঁহার জানুদ্বয় রক্তস্রাবে ভাসিয়া যাইত। এহেন রোগ কেবল হোমিওপ্যাথিকের বিন্দুপানে আরাম হইল দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। অতঃপর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ে তিনি সবিশেষ মনঃসংযোগ করেন।"[১]

সমকালীন কলকাতায় বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং বিজ্ঞান আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সৌহার্দ্য ও ডা: সরকারের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় মনোনিবেশ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা স্মরণ করা যায়। ডাক্তার সরকার প্রথমপর্বে এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করতেন এবং হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসার ওপর ভীষণ বিদ্বেষ ছিল তাঁর। তিনি প্রায়ই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নিন্দা করতেন। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং মহেন্দ্রবাবু হাইকোর্টের জজ অনারেব্‌ল দ্বারকানাথ মিত্র অসুস্থ হলে তাঁরা উভয়ে একত্রে তাঁকে দেখতে যান। তখন উভয়ের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যাপারে দারুণ বাদানুবাদ হয়। শেষে মহেন্দ্রবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা শিরোধার্য করে বলেন, "আমি এক্ষণে আর হোমিওপ্যাথির নিন্দা করব না; তবে পরীক্ষা করে দেখব, এর কি গুণ?" পরীক্ষায় তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যশস্বী হয়ে ওঠেন। তাঁর যশে সাহেব ডাক্তার বেরিণীর প্রতিপত্তি কমে গিয়েছিল। লোকে তারপর থেকে বেরিণীকে না ডেকে ডা: সরকারকেই ডাকতে লাগলেন। এইভাবে মহেন্দ্রলালের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অবশেষে ডা: বেরিণীকে এ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। ১৮৬৯ সালে ডা: বেরিণীকে বিদায় দিতে গিয়ে ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "কত সাহেব এ দেশে এসে পকেট ভরে টাকা নিয়ে গেল; আর আপনি শূন্য পকেটে ফিরছেন।"

তদুত্তরে বেরিণী বলেছিলেন, "আমি পাঁচ হাজার টাকা পকেটে পুরে নিয়ে যাচ্ছি।"

রাজেন্দ্রবাবু বিস্ময়ে বলেন— "সে কি রকম?"

ডাক্তার বেরিণী —- "মহেন্দ্র যে হোমিওপ্যাথিকের পক্ষপাতী হয়েছে, এরই মূল্য পাঁচহাজার টাকা।" এই সময় গোবরডাঙ্গার জমিদার সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতার ঝামাপুকুর নিবাসী রাজা দিগম্বর মিত্র হোমিওপ্যাথিকের পক্ষপাতী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের অন্যতম জীবনীকার চণ্ডীচরণ জানান যে, "মহেন্দ্রলাল দত্তর অ্যালোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথিতে মনোনিবেশ করানোয় বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অসামান্য; সেই কারণে ডা: সরকার বিদ্যাসাগরের ওপর কৃতজ্ঞ ছিলেন। সমকালে ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী, ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর প্রভৃতি অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে ও পরামর্শে ক্রমে ক্রমে এই পথে একে একে অগ্রসর হতে লাগলেন।"[২]

ক্রমেই বিদ্যাসাগর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের উপকারিতায় মুগ্ধ হতে লাগলেন। অতঃপর তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার উৎকট পীড়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরাম হয়েছিল—অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা হার মেনেছিল। এতে তিনি হোমিওপ্যাথির ওপর দারুণ ভক্ত হয়ে পড়লেন; এই উক্তির আতিশয্যেই তিনি তাঁর মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক তৈরী করেছিলেন।[৩] তাঁর প্রত্যয় জন্মাল এই (হোমিওপ্যাথি) ওষুধের উৎকৃষ্টতা, মূল্যের স্বল্পতা এবং গ্রহণের সুবিধা—দরিদ্র বঙ্গবাসীর অনুকূল চিকিৎসাব্যবস্থা। এই প্রস্তায় ঐ চিকিৎসাশাস্ত্রের সুপ্রচারে তিনি মনোনিবেশ করলেন।

কেবল প্রচারেই ক্ষান্ত নন তিনি। নিজেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে লেগে পড়লেন। কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীট নিবাসী ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষের কাছ থেকে এই চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ নিতে লাগলেন। তিনি বহুসংখ্যক হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসার বই কিনেছিলেন এবং সেগুলি অধ্যয়ন মনোনিবেশ করলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র শব-ব্যবচ্ছেদ ব্যতীত অসম্পূর্ণ বলে, তিনি কিছু নরকঙ্কাল কিনে, মানবদেহের গঠনবিন্যাস সম্পর্কে অনুশীলনে মগ্ন হলেন। সন্তোষ কুমার অধিকারী তাঁর এক লেখনীতে বিদ্যাসাগরের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আগ্রহ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বেরিণী তাঁকে (বিদ্যাসাগরকে) অভিভূত করেছিল। তাঁর প্রভাবে বিদ্যাসাগর হোমিওপ্যাথি পড়তে শুরু করেন। তাঁর লাইব্রেরীতে হোমিওপ্যাথিক বই-এর সংগ্রহ দেখবার মত জিনিস। জার, রাড়ক, হেরিং, হ্যানিম্যান থেকে শুরু করে আমেরিকান ও জার্মান গ্রন্থকারের অজস্র বই তিনি আনিয়েছিলেন। এই সব বই তখন এদেশে বিক্রীত হত না,. কাজেই তাঁকে সোজাসুজি নিউইয়র্ক বা জার্মানী থেকে আনতে হতো।"[৪]

এরপরই আমরা লক্ষ্য করব চিকিৎসক বিদ্যাসাগরকে। এই চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায় তাঁকে সু-চিকিৎসকে পরিণত করেছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন সর্বত্র তাঁর ব্যাগে হোমিওপ্যাথি পুস্তক ও হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স থাকত। চণ্ডীচরণের বিবরণক্রমে, "তিনি নিজে দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধানে ও অনুশীলনে একজন উপযুক্ত চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা অর্জন করিলেন এবং ক্রমে অন্য চিকিৎসকের সাহায্যে ব্যতিরেকে তিনি অতি কঠিন পীড়াক্রান্ত রোগীদিগের চিকিৎসায় কৃতকার্য হইতে লাগিলেন। হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা আরম্ভ করায় তাঁহার এই সুবিধা হইল যে, যখন-তখন যাকে-তাকে দেখিতে যাইতে পারিতেন ; এবং সময় অসময়ে কত লোক যে তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। .....তিনি লোকের রোগ যন্ত্রণার এতই ক্লেশ পাইতেন যে, তাহা নিবারণের জন্য সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। শূল ও হাঁপানি কাশীর ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সর্বদা বিতরণ করিতেন। যে যখন গিয়াছে বিনা মূল্যে ঔষধ পাইয়াছে।"[৫]

রোগীর সেবায়ও তিনি অনন্য। পরিণত বয়েসে তিনি কার্ম্মাটাড়ে থাকাকালে একবার তাঁর অতিথি হয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়। সেখানে ন্যায়ালঙ্কার মশাই খুব অসুস্থ হলে বিদ্যাসাগর স্বহস্তে তাঁর মল-মূত্র পরিষ্কার করেন। বর্ধমানে বসবাসকালে ম্যালেরিয়া ক্রান্ত মুসলমানদের গৃহে গিয়ে তাদের ওষুধ ও পথ্য দিয়ে এসেছেন;[৬] এই চিকিৎসা অভিযানেই কলেরা আক্রান্ত মেথর রমণীকে স্বহস্তে সেবায় সুস্থ করেছেন।[৭] ...."কার্ম্মাটাড়ে জনৈক সাঁওতাল প্রবল পীড়ায় শয্যাগত ; বিদ্যাসাগর তার শিয়রে বসে মুখে ওষুধ ঢেলে দিয়েছেন.....হাঁ করিয়ে তাকে পথ্য দিয়েছেন ..... তাকে ধরে মলমূত্র ত্যাগ করিয়েছেন ; সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন।"[৮] চিকিৎসাজগতে এসেও তিনি যে কী ভয়ঙ্কর নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লেখা তাঁর একখানি চিঠিতে (কার্ম্মাটাড় হতে লেখা) তা ব্যক্ত : "আমি কল্য অথবা পরশ্ব আপনাকে দেখিতে যাইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ দুইটি রোগীর চিকিৎসা

করিতেছি যে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কোনো মতে উচিত নহে। এজন্য ২/৪ দিন দেওঘর যাওয়া রহিত করিতে হইল।"[৯] বলাবাহুল্য যে তিনি তাঁর গরীব সাঁওতালদের জন্য যা করতেন (কী চিকিৎসা, কী সেবা... কী দান) অনেক চিকিৎসা ব্যবসায়ী অর্থের প্রাচুর্য্য নিয়েও সে নিষ্ঠায় কাজ করতে পারতেন না।

যদি আমরা দৃষ্টিকে ফেরাই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রচারাভিযানের দিকে তা হলেও সেখানে বিদ্যাসাগরের এক বিস্ময়কর ভূমিকা লক্ষ্য করব। দুঃস্থের বেদনায় তিনি চিরদিন মুখর। তাঁর জীবনী গ্রন্থ অনুসরণে অবগত হওয়া যায় যে পীড়িত জনগণের চিকিৎসায় তিনি ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, বিহারীলাল ভাদুড়ী, নীলমাধব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহুসংখ্যক চিকিৎসকের সাহায্য নিতেন। ডাক্তার সর্বাধিকারী মশাই বলেছেন যে, তাঁর (বিদ্যাসাগরের) অনুরোধক্রমে দিবারাত্র কতবার যে দুঃখী লোকের চিকিৎসার্থে গেছেন তার ধারাবাহিক বিবরণ দিলে এক আকার গ্রন্থ হতে পারে....কিন্তু সে ধারবাহিকতা স্মরণে নেই।[১০] তাঁর চিকিৎসা অভিযানের এক দুর্দমনীয় অভিজ্ঞতার চিত্র পাব যদি আমরা একটু পিছিয়ে সেই মন্বন্তরের সময় (১৮৬৬) ফিরে যাই। সময় ১৮৬৮ সাল। দুর্ভিক্ষের পরই বর্ধমানে ম্যালেরিয়া জ্বর সংহার মূর্তিতে হাজির হল .... রোগে ত্রাহি ত্রাহি রব....চিকিৎসার লোক নেই....ঘরে ঘরে কান্নার রোল....গ্রামে গ্রমে দিবারাত্র শ্মশান জ্বলছে..... কে কার কল্যাণে এগিয়ে আসবে? হিন্দু পেট্রিয়ট তার কম্বুকণ্ঠে এ সংবাদ পরিবেশন করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছে.....কিন্তু ব্যাপক ব্যবস্থা কই! সেই শ্মশান ক্ষেত্রেই হাজির হলেন বিদ্যাসাগর। রোগীদের চিকিৎসার জন্য 'ডিস্পেনসারি' স্থাপন করলেন। ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করলেন। তিনি কলকাতায় ফিরে সেই ম্যালেরিয়ার বীভৎস রূপ তৎকালীন ছোটলাট গ্রে-সাহেবের কর্ণগোচর করলেন। অতঃপর ব্যবস্থা হল—অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য স্থানে স্থানে 'ডিস্পেনসারি' খোলা; জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল পীড়িত ব্যক্তিকেই ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন বিদ্যাসাগর। এই সময়ের একটি মহতী মানবসেবার বিবরণে আমরা বিহারীলালকেই অনুসরণ করব: "এই সময় প্যারিচাঁদবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক সাহায্য করিতেন। তাঁহার উপর 'ডিস্পেনসারি'-র সম্পূর্ণ ভার ছিল। কুইনাইন বড় মূল্যবান, অথচ রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই জন্য গঙ্গানারায়ণবাবু পরামর্শ দেন যে, কুইনাইনের পরিবর্তে 'সিঙ্কোনা' ব্যবহার করা হউক। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন,—'গরীবের রোগ বলিয়া, প্রকৃত ঔষধ ব্যবহার করিবে না; এও কি কখন হয়? দুঃখী ধনী সবার প্রাণ তো একই; পরন্তু রোগও এক।' গঙ্গানারায়ণবাবু বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বে ডুবিয়া গেলেন; যে সব রোগী ঔষধ লইবার জন্য 'ডিস্পেনসারি'তে আসিতে পারিত না, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের বাড়ীতে গিয়া স্বয়ং ঔষধ-পথ্য দিয়া আসিতেন।"[১১] বর্ধমানের ডিস্পেনসারি ব্যতীত সমকালে তিনি কর্ম্মাটাড়ে ও বীর

সিংহেও দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থাপনায় বহু চিকিৎসালয় খুলেছিলেন ; বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চক্‌দীঘি গ্রামের জমিদার (সারদা প্রসাদ সিংহ রায়) পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্যতা ছিল .... সেখানে গিয়ে তিনি একটি বিদ্যালয় ও চিকিৎসাকেন্দ্র (দাতব্য) স্থাপন করেছিলেন। এবং অধিকাংশ চিকিৎসাকেন্দ্রের ব্যয়ভার ছিল তাঁর নিজেরই স্কন্ধে। অর্থ দিয়ে .....শ্রম দিয়ে....সময় দিয়ে... রোগগ্রস্তের পাশে দাঁড়িয়ে চিকিৎসার যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন বিদ্যাসাগর .... তা সেই শতকেই নয়, এই শতকের শেষদশকেও তার তুলনা মেলে না। কেবল এই প্রকৃতি দিয়ে বিচার করলেও বিদ্যাসাগরকে 'প্রাণের সাগর' নামে অভিহিত করতে হয়।

৫

বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা গঠনে ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বিদ্যাসাগর

জনমানসে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও বিজ্ঞাননিষ্ঠা প্রবেশ করানোর মুখ্য উপায় হিসাবে তিনি বেছেছিলেন শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার। এই অভিযানকে অব্যাহত রাখার জন্য তিনি নিজেই যেমন কলম ধরেছিলেন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যকে বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করতে সেইরকম তার ব্যাপক উদ্যোগ সংগঠনের জন্য চেয়েছিলেন বিজ্ঞান বিষয়ক ইংরাজী শব্দের উপযুক্ত বঙ্গীয় পরিভাষা সংগঠনে।[১]

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যাসাগর সৃষ্ট প্রতিশব্দগুলি হল : জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy), জ্যোতিষ্ক (Heavenly bodies), নক্ষত্রবিদ্যা (Astrology);
ভূ-বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট প্রতিশব্দগুলি: অংশ (Degree), উপকূল (Coast), ঔপনিবেশিক (Colonial), কক্ষ (Orbit), গ্রহ নীহারিকা (Planetarynabulae), ছায়াপথ (Milkyway), জলোচ্ছ্বাস (Tide), নাড়ীমণ্ডল (Equater), নীহারিকা (Nabulae), নৈহারিক নক্ষত্র (Nabulus stars), প্রস্তর ফলক (Slate), বন্ধুর (Rough), উপগ্রহ (Satellite) প্রভৃতি।

গণিতবিজ্ঞানেই তাঁর রচিত বহু প্রতিশব্দ অধুনা দৈনিক ব্যবহারে ব্যস্ত : পাটিগণিত (Arithmatics), গণিত (Mathematics), বিশুদ্ধ গণিত (Pure Mathematics), বিমিশ্র গণিত (Mixed Mathematics), কেন্দ্র (Centre) শঙ্কু (Index) প্রভৃতি।

পদার্থ বিজ্ঞানের বহু প্রতিশব্দ বিদ্যাসাগর আমাদের উপহার দিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানকে বাঙলাভাষায় শেখার আনুকূল্য দিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য প্রতিশব্দগুলি হল : দূরবীক্ষণ (Telescope), দৃষ্টিবিজ্ঞান (Optics), পদার্থবিদ্যা (Natural Philosophy), পর্যবেক্ষণ (Observation), প্রতিফলন (Reflection), প্রতিফলিত দূরবীক্ষণ (Reflecting Telescope), স্থিতিস্থাপক (Elasticity) প্রভৃতি। Focal distance ইংরাজী শব্দের প্রতিশব্দ করেছেন 'আধিশ্রায়নিক ব্যবধি' নামে।

রসায়নশাস্ত্রে প্রাপ্ত বিদ্যাসাগরকৃত প্রতিশব্দের সংখ্যা যথেষ্ট না হলেও উল্লেখের দাবীদার: ধাতুবিদ্যা (Mineralogy) ভূগর্ভে উৎপন্ন নির্জীব পদার্থ, যেমন স্বর্ণ, প্রস্তর, পারদ, অঙ্গার ইত্যাদি বিষয়কবিদ্যা। বিভিন্ন ধাতুর বঙ্গীয় নামকরণে (Copper-তাম্র, Lead-সীসা প্রভৃতি) ও বিবরণে ধাতু পরিচিতি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাবে উপস্থিত হয়েছে তাঁর বোধোদয়ে।

উদ্ভিদ, তরু-গুল্মাদির প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞান Botany-র নামকরণ করেছেন 'উদ্ভিদবিদ্যা' প্রতিশব্দের মাধ্যমে। Natural law-এর প্রতিশব্দ করেছেন 'জাতীয় বিধান' নামে এবং 'প্রকৃতি' প্রতিশব্দ দিয়েছেন Nature-এর।

প্রাণিবিদ্যার যথেষ্ট প্রতিশব্দ বিদ্যাসাগর প্রদত্ত তালিকায় না পাওয়া গেলেও নিম্নলিখিত প্রতিশব্দগুলি তাঁর রচনা থেকেই জ্ঞাত হওয়া যায়: মেরুদণ্ড (Axis), চিত্রশালিকা (Museum), উভচর (Amphibians), সরীসৃপ (Reptiles) প্রভৃতি।

সর্বোপরি, পদার্থের তত্ত্বনির্ণায়কশাস্ত্র সায়েন্স (Science)-এর প্রতিশব্দ 'বিজ্ঞান' তাঁর কণ্ঠেরই সোচ্চার ঘোষণা।

এখন আমরা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান সংগঠনে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ লক্ষ করব। বিজ্ঞান সচেতনতাই বিদ্যাসাগরের চরিত্রের বড় বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানচর্চা তাঁর কাছে কোন তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাস হিসাবে দেখা দেয় নি, বিজ্ঞানচর্চাকে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অন্তর্গত করতে চেয়েছিলেন। তাই লক্ষ্য করা যায় তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির জন্যে যে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেছিলেন তার অন্তর্ভুক্ত ছিল ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি। ১৮৫২ সালে স্কলারশিপ পরীক্ষায় তার রচিত প্রশ্নপত্রে রচনা লিখতে বলা হয়, "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনুশীলন থেকে যে উপকারগুলি পাওয়া যায় তার পরিচয় দাও।"[২]

বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমানস সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সবচেয়ে বড় পরিচয় 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' স্থাপনে তাঁর সহযোগিতা। "উনিশ শতকে এদেশে বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ১৮৭৬ সালে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা (যা পরে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স নামে পরিচিত হয়) নামে বিজ্ঞানচর্চার একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। অনতিকাল পরে এই সভার সুবৃহৎ গৃহ এবং সুসজ্জিত পরীক্ষাগার নির্মিত হয়েছিল—যার মাধ্যমে দেশীয় জনগণের মনে বিজ্ঞান গবেষণা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনার উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল।"[৩]

এই 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' স্থাপনে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে বিদ্যাসাগর যেমন উৎসাহ জুগিয়েছিলেন তেমনি তাঁর হাতে তিনি তুলে দিয়েছিলেন এক হাজার টাকা ১৮৭০ সালের জানুয়ারী মাসে। সেদিনের সমাজে এই অর্থ সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা বিজ্ঞানসভার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে ডাঃ মহেন্দ্রলালকৃত 'ভারতবর্ষীয়

বিজ্ঞানসভা'র 'অনুষ্ঠান পত্রের' মুখ্য নির্দেশগুলি লিপিবদ্ধ করা হল — যাতে সমকালীন বিজ্ঞান আন্দোলনে ঐ প্রতিষ্ঠানে ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুভূত হয়:

"ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার অনুষ্ঠানপত্র:[৫]

(১) বিশ্বরাজ্যের অন্তঃকরণের আশ্চর্য ব্যাপার জানার কৌতূহল সংশ্লিষ্ট জ্ঞানই বিজ্ঞানশাস্ত্র।

(২) পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের চর্চ্চার বিষয় ছিল জ্যোতিষ, বীজগণিত, মিশ্রগণিত, রেখাগণিত, সামুদ্রিক, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব প্রমুখ। ঐ সমস্ত বিজ্ঞান আলোচনা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

(৩) এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে, তন্মিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

(৪) ভারতবর্ষীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার উদ্দেশ্য।

(৫) সভা স্থাপন করিবার জন্য একটি গৃহ, কতকগুলি বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র এবং কতকগুলি উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তি বিশেষ আবশ্যক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে, কিছু জমি ক্রয় করা ও তাহার উপর একটি আবশ্যকানুরূপ গৃহ নির্মাণ করা, বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র করা এবং যাঁহারা এক্ষণে বিজ্ঞানানুশীলন করিতেছেন কিম্বা যাঁহারা এক্ষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত অভিলাষী কিন্তু উপয়াভাবে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, এরূপ ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞানচর্চা করিতে আহ্বান করা হইবে।

(৬) এই সমুদয় কার্য সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যক। অতএব ভারতবর্ষের শুভানুধ্যায়ী ও উন্নতীচ্ছুক জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা আপন আপন ধরনের কিয়দংশ অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ে উন্নতি সাধন করুন।

(৭) যাঁহারা চাঁদা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের নাম পরে প্রকাশিত হইবে, আপাততঃ যাঁহারা সাক্ষর করিতে কিম্বা চাঁদা দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা নিম্ন সাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত হইবে।

অনুষ্ঠাতা

শ্রী মহেন্দ্রলাল সরকার"

কার্যত এই 'বিজ্ঞানসভা' দেশীয় জনগণকে বিজ্ঞানে উৎসাহিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্যতীত সমকালীন কিছু স্মরণীয় ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় যাঁরা এই বিজ্ঞানসভায় অর্থ সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র সেন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল, যদুনাথ মল্লিক, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, রামচন্দ্র

দত্ত প্রমুখ।[৬] পরবর্তীকালে (১৮৮৫) এই সভায় পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের (গ্যাসের ধর্ম, শব্দতরঙ্গের পরিবহন, তাপীয় তড়িৎ বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রভৃতি) ক্লাস নিয়েছেন অধ্যাপক লাফোঁ এবং মহেন্দ্র লাল স্বয়ং[৭] এবং রসায়ন বিষয়ে ক্লাস নিয়েছেন ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত।[৮] বিজ্ঞানসভার এক সমকালীন টিকিটের নমুনায় প্রকাশ যে "একটি টিকিটে বারটি বক্তৃতার উল্লেখ আছে এবং ঐ বারটি বক্তৃতা শোনার জন্য প্রবেশমূল্য ছিল এক টাকা আট আনা, একটি বক্তৃতার জন্য চার আনা, প্র্যাকটিকাল ক্লাসে যাতে সবকিছু দেখানোর ব্যবস্থা ছিল তার জন্য স্থির ছিল চার আনা[৯] এবং মহিলাদের জন্য পৃথক প্র্যাকটিকাল ক্লাসের ব্যবস্থা ছিল"[১০]— উল্লিখিত ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় বিদ্যাসাগর সাহায্যপুষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান 'বিজ্ঞানসভা' গণ-বিজ্ঞান চেতনার প্রবাহ দিয়েই তার শুভ যাত্রা শুরু করেছিল।

৬

বিজ্ঞানমনস্কতার অনুশীলনে বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিশ্লেষণে যে বস্তুটি সবার আগে নজরে আসে সেটি তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা। তিনি আজীবন এহেন মননশীলতার ধারক ও বাহক। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলী এই বৈজ্ঞানিক মানবিকতাবাদের স্বপক্ষে যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা উত্থাপন করেছেন আমরা তার মধ্যে মুখ্য দশটি বৈশিষ্ট্য বেছে নিয়েছি এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর আমরা বিদ্যাসাগরের ক্রিয়া-পারম্পর্য অনুসরণ করব। সংশ্লিষ্ট ঘটনায় বৈজ্ঞানিক হাক্সলী উল্লেখ করেন, "The conflict between science and human nature, can only be reconciled in an attitude and a temper of mind which may fittingly be called scientific humanism." হাক্সলী বর্ণিত বিজ্ঞানমনস্কতা গঠনকারী যে দশটি বৈশিষ্ট্যের ওপর বিদ্যাসাগরের মানসিকতা অনুসরণ করব সেগুলি হল : সংস্কারমুক্ত চেতনা, জাতীয়তাবোধ, প্রতিবাদী মানস, আধুনিকতা, যুক্তিবাদ, সাংগঠনিক প্রবণতা, আত্মমর্যাদাবোধ, ত্যাগাদর্শ, পরার্থপরতা ও মূল্যবোধ।

সংস্কারমুক্ত চেতনা

প্রথমতঃ বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুক্ত মানসিকতার প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়। তাঁর সংস্কারমুক্ত মানসিকতার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় তাঁর শিক্ষা সংস্কারবিষয়ক অভিযানে, নারীশিক্ষার প্রবর্তনে, বিধবা বিবাহ প্রচলনে, বহু বিবাহ রোধের উদ্যোগে এবং জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী চর্চায়।

প্রথমেই আসা যাক্ তাঁর শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক অভিযানে। এ দেশ তখন আচার ও অন্ধ-কুসংস্কারের চারণভূমি। ধর্মের নামে যত অনাচার অবিচার ও অসৎ বৃত্তিতে লোক মশগুল, ন্যায় নীতি যুক্তি পুরোপুরি অন্তর্হিত, বিদ্যাসাগর সেই শ্মশানভূমে সর্বাগ্রে চেয়েছেন এদেশের 'ম্লান মূক মুখে' ভাষা দিতে; যাতে তারা ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, কু-সু-এর পার্থক্য বুঝে নিতে পারে অন্তর্চেতনা দিয়ে।

সংস্কৃত কলেজে তাঁর প্রথমবার (১৮৪৬-৪৭) ও দ্বিতীয় বার (১৮৫০-৫৮) অবস্থানকালে তাঁর ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা সংস্কার সংশ্লিষ্ট তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন স্মরণীয়। তাঁর প্রথম প্রস্তাবনায় (১৮৪৬) তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজী সমৃদ্ধ

জ্ঞান-ভাণ্ডারকে একত্র করে, তার ভিত্তিতে পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞানার্জনের পরামর্শ দেন। এই জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হলে এদেশীয় তরুণেরা মাতৃভাষায় ঐ বিদ্যাকে প্রচারে সক্ষম হবে— এ জাতীয় মন্তব্যও সেখানে রেখেছিলেন। শিক্ষাসংক্রান্ত তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবনা (১৮৫২)—'নোটস অন দি সংস্কৃত কলেজ' নামে খ্যাত। এই প্রস্তাবনায় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার ওপর জোর দিতে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির কথা এবং শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে প্রাচ্য শিক্ষা (মনুস্মৃতি, মিতাক্ষরা) ও পাশ্চাত্য শিক্ষা (গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান) প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করেন। এই প্রস্তাবনার উল্লেখ্য বিষয় হল, গণিত শিক্ষা ইংরাজীর মাধ্যমে সংগঠন এবং দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃজন সংক্রান্ত পরামর্শ। তৃতীয় প্রস্তাবনার অস্তিত্ব লক্ষিত হয় বিদ্যাসাগরকৃত ব্যালেন্টাইনের চিঠির জবাবে (১৮৫৩) এবং তাতে তিনি উল্লেখ করেন, "জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার—বাংলা স্কুল স্থাপন ও মাতৃভাষায় দখলযুক্ত শিক্ষক সৃজনের কথা।"[১]

শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত মতামত আদান-প্রদানকালে তাঁর তত্ত্বাবধানে ও সহযোগিতায় বাংলার বুকে একাধিক বিভিন্ন প্রকার স্কুল সংগঠনের ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়: "ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা করা কালে (১৮৪৪-৪৫) তিনি হার্ডিঞ্জ সাহেবের সঙ্গে ১০১টি বাংলা বিদ্যালয় খোলার পরামর্শ করেন, সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন এবং নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলাতে ২০টি বাংলা মডেল স্কুল চালু করেন।"[২] কেবল বিদ্যালয় স্থাপনই নয়, সমকালে তাঁর লেখনী থেকে একাধিক বাংলা পুস্তক (বেতাল পঞ্চবিংশতি, বাঙ্গালীর ইতিহাস, বোধোদয়, শকুন্তলা, বর্ণ পরিচয়—দুই খণ্ড) আত্মপ্রকাশ করে। এই সমুদয় উদ্যোগই দেশীয় ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা চেতনা জাগানোর প্রারম্ভিক পদক্ষেপ।

শিক্ষার মাধ্যমে নারীজাতির জাগরণের হাতেখড়ি পেয়েছিল বিদ্যাসাগরের হাতে। "সমাজে নারীর নির্যাতনে তিনি ব্যাকুল হয়েছেন। তিনি দেখেছেন, গায়ের জোরে এবং সামাজিক প্রশ্রয়ে পুরুষ নারীকে ধর্ষণ করেছে, তার ওপর বীভৎস অত্যাচার করে চলেছে। তার শিক্ষার অধিকারকে লুপ্ত করে, জীবনের সকল সাধারণ অধিকারকে অস্বীকার করে, কৃত্রিম পুণ্যের ঠাঁট তাদের ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে রেখে শৃঙ্খলিত পশুর মতো নির্যাতন করেছে। শিশু বা বৃদ্ধা কেউ-ই অব্যাহতি পায়নি সে অত্যাচার থেকে।

অশিক্ষা, অজ্ঞতা, অন্ধতা ও সমবেত নির্যাতনের হাত থেকে নারীকে মুক্তির আলোতে নিয়ে আসাই জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাজ বলে মনে করছেন বিদ্যাসাগর। তাই ১৮৪৯ সালে যখন 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' স্থাপন করলেন জে. ই. ডি. বেথুন, তখন এ কাজে তিনি তাঁর সহযোগী ও সহকর্মী হয়েছেন। বেথুনের ইচ্ছাতেই তিনি ঐ স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক হন এবং স্কুল পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক হিসাবে

তাঁর প্রভাব যখন অপ্রতিহত, তখনই তিনি স্ত্রীশিক্ষা প্রসার এবং নারীর অধিকার রক্ষার কাজে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৮৫৭-৫৮-তে এক বছরের মধ্যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং গভর্ণমেন্ট সেই বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার বহনে অসম্মত হ'লে সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে তিনি এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বালিকাদের জন্য শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক প্রয়াস ভারতবর্ষে এই প্রথম।”[৩]

তাঁর শিক্ষা সংস্কারে আমরা লক্ষ্য করেছি তিনি কিভাবে শিক্ষা মনোজ্ঞ ও সর্বজনীন করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি প্রাথমিক পাঠে বাংলা ভাষার ওপর জোর দিয়েছেন, সংস্কৃত অলঙ্কারের জায়গায় ইংরাজী পঠন-পাঠন বাধ্যতামূলক করেছেন এবং সামাজিক অনুশাসন সম্বলিত সাংখ্য বেদান্ত দর্শনের পরিপূরক হিসাবে ইউরোপীয় দর্শন পঠনের ওপর জোর দিয়েছেন।[৪]

দেশে শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগে বিদ্যালয় গঠন ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও সক্রিয়তা উল্লেখের দাবী রাখে: “স্বগ্রামে (বীরসিংহে) তিনি নিজের টাকা ব্যয়ে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলেছিলেন। শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে জীবিকা ছেড়ে বিদ্যালয়ে আসা সম্ভব নয়, এ সত্য তিনি অনুধাবন করতেন এবং সেই উদ্যোগেই ১৮৫৩ সালে বীরসিংহে ঐ সমস্ত শ্রমজীবী কৃষকদের নিয়ে প্রথম নৈশ বিদ্যালয চালু করেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—“যাহারা অন্যের বাটিতে বেতন গ্রহণ করিয়া দিবসে গরু চরাইত, বা যাহারা দিবসে কৃষিকর্ম করিত, তাহাদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য নাইট স্কুল স্থাপন করিলেন।”[৫]

কেবল প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নয় উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্যও তাঁর চেষ্টা কম নয়। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনকে সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বৃহৎ বেসরকারী কলেজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সর্ববৃহৎ ক্রিয়াকাণ্ড বিধবা বিবাহ। দেশীয় সমাজ পরিকাঠামোয় বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ (কৌলিন্য প্রথা) হিন্দু সমাজে স্বাভাবিক ভাবে কিশোরী বিধবার সৃজন ঘটাত। এই বাল্য বিধবাদের ব্যক্তি জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তো বিসর্জন হতই সেই সঙ্গে তারা হয়ে উঠত গৃহের অবাঞ্ছিত ভার। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার নারী নিগ্রহের এই চরম বঞ্চনার দিক্‌টি উনিশ শতকের তিনের দশকে[৬] আলোচ্য বিষয়ে হলেও—এ ব্যাপারে আন্দোলনের রূপ পেল বিদ্যাসাগরের হাতে পাঁচের দশকে; তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এরপর তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলনের স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় সমর্থন ভিত্তিতে বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তিকা (১৮৫৫) রচনা করেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণের জন্য তিনি তাঁর পুস্তিকায় মনুসংহিতা, পরাশর সংহিতা, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র উদ্ধৃতির উপস্থাপনা ঘটিয়ে এই প্রকল্প চালু করার জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তাঁর পুস্তিকায় এই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে দেশীয় বাল্য বিধবার চরম দুর্গতির চিত্র জনমানসের সামনে তুলে ধরতে

চেয়েছেন যাতে জনগণ এ জাতীয় আন্দোলনের সমর্থন জানান। তিনি জানিয়েছিলেন : "দুর্ভাগ্য ক্রমে যাহারা বাল্যকালে বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করে ব্রহ্মচর্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যা পাকে লিপ্ত হইতেছে; বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিবারণ হইতে পারে।"[৭]

এই আন্দোলনের তৃতীয় ধাপে লক্ষ্য করা যায় তিনি ভারত সরকারের কাছে বিধবা বিবাহ আইন সম্মত করার জন্য আবেদন করেন (১৮৫৫)। অতঃপর ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হল। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে বিধবা বালিকা ভবসুন্দরীর বিবাহ দেন।

এরপর সমাজসংস্কারক কর্ম হিসাবে 'বহুবিবাহ' বা 'কৌলীন্য প্রথা' রহিত করার আন্দোলনে অংশ নেন। এই প্রথায় একজন কুলীন ব্রাহ্মণ অসংখ্য মহিলার পাণিগ্রহণ করে এবং কারো সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব বহন করে না। এই প্রথামত একজন অতিবৃদ্ধ কুলীন স্বামীও ১০ বছরের এক মেয়ের শাস্ত্রীয় স্বামী হয়ে তার অরক্ষণীয়ত্ব মোচনে অংশগ্রহণ করত। ঐ কুলীন স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী-কুল গণ-বিধবায় পরিণত হতেন। তারপর সেই সমস্ত ভাগ্যহতাই হতেন সমাজের পরগাছা। ক্লডিয়াস বুকানন ১৮০৫ সালে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, "এই প্রথা মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণের অন্যতম কারণ।"[৮] কলকাতার চিফ ম্যাজিস্ট্রেটের হিসাব অনুযায়ী ১৮৫৩ সালে কলকাতার ১২,৪১৯ জন দেহোপজীবিনীর মধ্যে অনেকেই কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা।[৯] এ জাতীয় মানবঘৃণা দেখে বিদ্যাসাগরের পক্ষে চুপ করে সম্ভব ছিল না। তিনি জেলার বিভিন্ন জায়গায় অন্বেষণ করে কুলীন ব্রাহ্মণদের নাম এবং তাঁদের বিবাহের সংখ্যার তালিকা তৈরী করেছিলেন। সেই তালিকা মতে মোট ১১৭টি গ্রামে ৬৫২ জন বহু বিবাহকারীর ৩৫৬৮টি বিবাহের কথা জানা যায়।[১০] এই ঘৃণ্য প্রথা রহিতকল্পে তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করেন ১৮৬৬ সালে।

অতঃপর তাঁর ব্যক্তি জীবনে সমাজ-সচেতনতা ও সংস্কারমুক্ত মানসিকতা পর্যালোচনা করা যায়। তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও, গলায় উপবীত ধারণ করেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নির্ধারিত জাতিভেদ কখনও মানেন নি। বর্ধমানে অবস্থানকালে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সরল দুঃস্থ ও অনাথ ব্যক্তিদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। কার্মাটাড়ে অবস্থানকালে ঐ অঞ্চলের সাঁওতাল, জেলে ও অন্যান্য নিম্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে সহজ ও সাবলীল সম্পর্ক তাঁর সংস্কারমুক্ত মানসিকতাকে ব্যক্ত করে। এই প্রেক্ষাপটে তাঁর বিশেষ পদক্ষেপ লক্ষিত হয় ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজে জাতিভেদের অবসান ঘটিয়ে সকলের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করেন। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর সখ্যতা উল্লেখের দাবী রাখে। বর্ধমানে বসবাস কালে (১৮৬৮) তাঁর বাড়ীর "সন্নিকটস্থ মুসলমান পল্লীর বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ আত্মীয়তা গড়ে ওঠে এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরা তাঁর পোষ্যবর্গের

মধ্যে পরিগণিত হয়ে ওঠেন।... দীর্ঘকালব্যাপী সংক্রামক জ্বরে বর্ধমানের অসংখ্য লোক যখন মৃত্যুমুখে পতিত, বিপন্ন, শ্রীভ্রষ্ট, বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন দরিদ্রগণের দ্বারে দ্বারে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করে বেড়াতেন; অনেকে দেখেছেন, কৃশ ও রুগ্ন মুসলমান শিশু সন্তান তাঁর পবিত্র কোলে স্থান পেয়েছে... কেউবা স্ব-চেষ্টায় তাঁর কোলে ওঠার চেষ্টা করছে, ভুলেও কখনো অপবিত্রতার যন্ত্রণা অনুভব করেন নি।"[১১]

বিহারীলালের উল্লেখ থেকে অবগত হওয়া যায় যে "ফরাসডাঙ্গায় অবস্থানকালে (১৮৯০) এক অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁকে লুচি তৈরী করে পেট ভরে খাওয়াতেন এবং প্রতি রবিবার আসার জন্য অনুরোধ করতেন। বিদায়কালে ঐ ভিক্ষুককে দুই টাকা দিতেন।"[১২]

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, "অখিলউদ্দিন মুসলমান বাউলকে তিনি কলকাতার বাড়িতে আনিয়ে মাঝে মাঝে তার দেহতত্ত্বের গান শুনে মানসিক প্রদাহ থেকে ক্ষণকালের জন্য মুক্তি পেতেন। অখিলউদ্দিন তাঁকে শোনাত :

তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা,
আপনার নামটি রাখব কোথা
সে নাম হৃদয়ে গাঁথা,
আমার গোঁসাঞি চাঁদ বাউল বলে—
সে নাম ভুলব নারে প্রাণ গেলে।"[১৩]

এইভাবে শিক্ষা সমাজ ও মনন সংস্কারের মাধ্যমে প্রাচীন গণ্ডির বেড়া ভেঙে বেরিয়েছেন বিদ্যাসাগর!

জাতীয়তাবোধ

জাতীয়তাবোধের চেতনাও লক্ষ্য করা যায় বিদ্যাসাগরের মনন ও কর্মকুশলতার মধ্যে। তাঁর শিক্ষানীতির মধ্যে চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও ফরাসী বিপ্লবসহ আধুনিক সভ্যতার বিজ্ঞান ও শিল্পবিপ্লবের বিজয়বার্তাকে গ্রহণ করার পুরুষকার ছিল বিদ্যাসাগরের মনে ও দেহে। সেই কারণে লক্ষ্য করা যায় দেশীয় ধর্মশাস্ত্রের সমালোচনায় কখনও মুখর তিনি—কিন্তু তাই বলে ভারতাদর্শের চেতনাবিমুখ তিনি নন। শিক্ষায় কর্মে প্রতিনিয়ত ব্রিটিশরাজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে সঙ্গত করেও পাশ্চাত্যের 'হ্যাট-কোটে' বিলীয়মান হননি। 'চটি-চাদর-কাপড়ের' ভারতীয় পণ্ডিতের প্রতিমূর্তিটি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রক্ষা করে গেছেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনের বিশেষতঃ দুটি ঘটনা উল্লেখ করা যায় — যা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর কাছে কোনরকমে অবদমিত না হওয়ার ঘটনা। প্রথম ঘটনাটি ছিল হ্যালিডে সাহেব সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল এশিয়াটিক সোসাইটির

পরিদর্শন সংক্রান্ত। প্রথম ঘটনায় প্রকাশ, "ছোটলাট পদে আসীন হয়ে হ্যালিডে সাহেব একবার তাঁর সুহৃদ্ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা করেন এবং বাড়িতে সেরকম অভ্যাগতদের আপ্যায়নের আয়োজন করেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেছিলেন বড়বাড়িতে আসার উপযুক্ত অভিজাত-পোশাক-পরিচ্ছদে অর্থাৎ ইজের, চোগা, চাপকান, শামলা ইত্যাদি পোশাক পরিধারণ করে আসেন ; বিদ্যাসাগর ছোটলাট নির্দ্বিধ কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, 'এসব পোশাক আমি পরতে চাই না, খারাপ লাগে।' হ্যালিডে সাহেবকে তাঁর কাছে হার মানতে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'তা হলে আপনার যেরূপ অভিপ্রেত সেরূপ পোশাকেই আসবেন।' বিদ্যাসাগর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ চটি-চাদর-কাপড়েই লাটভবনের সাহেবী আপ্যায়নে হাজির হয়েছেন।"

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, "পরিণত বয়সে বিদ্যাসাগর বোম্বাই হতে আগত হিন্দি সাহিত্যিক ভারতেন্দু হরিশচন্দ্রকে এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালা দেখতে নিয়ে যান। সংগ্রহশালা ঢুকতে গিয়ে তিনি বাধা পেলেন ; কারণ তখন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে 'চটি পরে সংগ্রহশালায় প্রবেশ নিষেধ। হয় সাহেবী জুতা পরে ঢুকতে হবে, নতুবা খালি পায়ে'— এ ঘোষণা বিদ্যাসাগরের কাছে অপমানবোধ মনে হল — এ অপমান ও নিগ্রহ! বিনাদ্বিধায় তিনি ফিরে এলেন। তাঁর বন্ধু-সঙ্গীর প্রবেশে বাধা ছিল না—যেহেতু তিনি প্যান্ট-বুট পরিহিত ছিলেন। কিন্তু তিনিও আর প্রবেশ করলেন না। পরে এ ঘটনা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হলে তাঁরা বিদ্যাসাগরকে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন ; কিন্তু অনমনীয়। তিনি জানান, 'সাধারণের জন্য এক নিয়ম আর আমার জন্য আর এক নিয়ম, এরূপ নিয়ম বিপর্যয়ের প্রশ্রয় দিতে আমি কোনো মতেই সম্মত নহি।' তারপর এ বিষয় নিয়ে বহু বিতর্ক (দি গ্রেট শু কোশ্চেন) হয়। যাদুঘর ও সোসাইটি কর্তৃপক্ষ, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এবং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট পর্যন্ত লেখালিখি হলেও ব্রিটিশ সরকার মত পরিবর্তন করেননি—আর বিদ্যাসাগরও জাতির অপমানবোধে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আর ঐ যাদুঘরে প্রবেশ করেননি।"[১৫]

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক প্রগতিবাদী চিন্তার একটু বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে কিভাবে তিনি সেই সাম্রাজ্যবাদী শাসকের আওতায় শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় চেতনার জাগরণের বীজ অঙ্কুরিত করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক তাঁর চিন্তার মূল পরিকাঠামো রয়েছে তাঁর 'নোটস অন দি সংস্কৃত কলেজ'-এর বক্তব্যে যা আগের আলোচ্য সূচীতে আমরা আলোচনা করেছি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা যায়, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসংস্কার প্রস্তাবকে দুর্বল করার উদ্যোগে তদানীন্তন বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ ব্যালেন্টাইন সরকারের কাছে এক রিপোর্ট পেশ করলেন। তাতে বলা হল : সাংখ্য ও বেদান্তের পাশাপাশি বার্কলের ভাববাদী দর্শনও পড়ানো হোক। তখন বিদ্যাসাগর ব্যালেনটাইনের জবাবে চিঠি দিলেন (১৮৫৩ সালে) "জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার—এই এখন আমাদের প্রধান প্রয়োজন ; আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করতে

হবে। এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করতে পারে এমন একদল কর্মী সৃষ্টি করতে হবে—তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। **মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্তি—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই**। এই ধরনের দরকারী লোক গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য ও সংকল্প।"[১৫]

বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি ও পাঠক্রম বিন্যাস সবের মধ্যেই এক জাতীয় চেতনার পরিকাঠামো লক্ষ্যের বিষয় : "১৮৫১ থেকে ১৮৫৪ দফায় দফায় বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার ও সংস্কারের জন্য বিদ্যাসাগর যে মূলনীতিগুলি প্রস্তাব করেছিলেন, তা ছিল সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জরুরী প্রয়োজনীয়তা, মাতৃভাষা বাংলাতেই ব্যাপকতম শিক্ষাদান, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে তৎকালীন পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বিদ্যার্জন, সর্বপ্রকার অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত শিক্ষাদান এবং এই ধরনের শিক্ষাদানের উপযোগী দক্ষ শিক্ষকবাহিনী তৈরী করা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তো বটেই, আজকের দিনেও এর চেয়ে অগ্রসর শিক্ষা-চিন্তার পরিচয় পাওয়া কঠিন।"[১৬]

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-আন্দোলনের আর এক বিশেষ জাতীয় চরিত্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন বদরুদ্দীন উমর : "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই অবদানের মধ্যে শুধু তাঁর কৃতিত্ব নয়, তাঁর প্রগতিশীলতারও যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। .....তিনি সংস্কৃত রচনা পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে বাঙলা ভাষায় এক নতুন শব্দবিন্যাস রীতি প্রচলন করেছিলেন। এই রীতির ওপর ভিত্তি করেই মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, কেশব সেন, মোশারফ হোসেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের রচনা ঊনিশ শতকে প্রকাশ করেছিলেন, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের ভাষারূপে বাংলা ভাষার অনেকখানি উৎকর্ষ সাধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর ফলে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক নিয়মে এবং স্বাভাবিকভাবেই কমে এসেছিল ; ইউরোপে যেমন কমে এসেছিল জাতীয় ভাষাগুলির মধ্যে লাটিন শব্দের ব্যবহার।.....বিদ্যাসাগরের সহজ ব্যাকরণ রচনা, বাক্যবিন্যাস রীতি, অনুবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা ভাষার উন্নতি সাধন করে শুধু যে নব-নব সাহিত্য সৃষ্টির পথই উন্মুক্ত করেছিল তাই নয়, তিনি সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং প্রয়োগকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করেছিলেন ; এবং এর ফলে ঊনিশ শতকেই বাংলা ভাষা বাঙালী জাতির জাতীয় ভাষা রূপে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পরিগ্রহ করেছিল। এবং এর প্রভাবে সমকালে ঊনিশ শতকে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলির বিকাশও শুরু হয়।"[১৭]

তাঁর শিক্ষাচেতনায় জাতীয়তাবোধের চেতনা প্রসঙ্গে বি. আর. পুরকায়েত তাঁর 'ইন্ডিয়ান রেনেসাঁস অ্যান্ড এডুকেশন' গ্রন্থে বিদ্যাসাগরকে 'জাতীয় শিক্ষা চেতনার উদ্গাথা' বলে বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেছেন, "He was a patriot and a true nationalist. He was an ardent advocate of

non-official, secular and popular institution for higher education with a purely Indian teaching staff. This is clearly evident from his untiring zeal to establish the Metropolitan Institution. Vidyasagar strongly pleaded for learning of three languages both in school and colleges — Vernacular, Sanskrit and English. He also strongly advocated for education through the mother tongue.

Vidyasagar was fully conversant and acquainted with the then psychological writings and researches in educational issues. He was dead against corporal punishment of students and making adverse and uncharitable remarks in the class which would wound the sentiments and personality development of the students. He introduced summer vacation and Sundays as holidays.

Many of the present day educational issues can be raced back to the days of Vidyasagar. We have inherited number of educational fruits due to untiring zeal and educational efforts of Vidyasagar. He has truely been described by Rabindranath as the first 'Siksha Guru' of the Bengalee.

The Bengal Renaissance was not limited to the Bengal boundary only. It has its sure repercussions in other parts of India particularly Bombay, Maharastra and Punjab.'"[১৮]

উল্লিখিত বক্তব্যের বঙ্গানুবাদ দাঁড়ায় 'বিদ্যাসাগর দেশপ্রেমিক ও প্রকৃত জাতীয়তাবাদী। যদিও তিনি ত্রি-ভাষাতত্ত্বের (বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী) সমর্থক কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। .....এখানেই সমাপ্ত নয়, বিদ্যার্থীদের মননশীলতা অনুসারী শিক্ষাব্যবস্থার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন .... বিদ্যার্থীদের অযথা তিরস্কার ও শাসনের তিনি পরিপন্থী .... রবীন্দ্রনাথ সেই কারণে তাঁকে যথার্থ শিক্ষাগুরু রূপে বন্দনা করেছেন। ....বাংলার নবজাগরণ কেবল বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর প্রেরণা সুদূর পাঞ্জাব, বোম্বাই, মহারাষ্ট্রকেও জাতীয়তাবোধে সঞ্জীবিত করেছিল।"

কেবল মননে ও কর্মধারায় নয়, বিদ্যাসাগরের লেখনীতেও তাঁর স্বদেশপ্রীতির এক উজ্জ্বল মূর্তি পরিস্ফুট। ভারতে বিদেশী শাসন সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামত তিনি লিখে রেখে যাননি। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী অশোক সেন, তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'বিদ্যাসাগর অ্যান্ড হিস ইলিউসিভ মাইল স্টোন'-এ 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে বিদ্যাসাগর যা লিখেছিলেন তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন।

পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'বাংলার ইতিহাস'-এ বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "যদি মীরজাফর. বিশ্বাসঘাতক না হইতেন এবং ঈদৃশ সময়ে এরূপ প্রতারণা না

করিতেন, তাহা হইলে ক্লাইভের কোনও ক্রমে জয়লাভের সম্ভবনা ছিল না।"[১৯] আবার নন্দকুমারের ফাঁসির ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন, "নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন যথার্থ বটে; কিন্তু ইম্পি ও হেস্টিংস তাহা অপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহার সন্দেহ নাই।"[২০]

এর থেকে ইংরাজদের ভারত জয় ও ভারত শাসন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের একটি সতেজ মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে।

অশোক সেন আরও দেখিয়েছেন যে, "বর্ধমানের মহারাজা একবার বিদ্যাসাগরের অনেকটা দেবোত্তর জমি দান করতে চাইলে, বিদ্যাসাগর সে দান গ্রহণে অসম্মতি জানান। তার পরিবর্তে বিদ্যাসাগর তাঁর সৎকর্মের প্রতি মহারাজের সমর্থন কামনা করেছিলেন। ঊনিশ শতকে জমির মালিকানা প্রশ্নে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই নিস্পৃহতা একান্তই বিরল।"[২১]

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ করা যায়; চণ্ডীচরণ তাঁর 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "ব্রাহ্ম সমাজে জাতীয় ভাব সুরক্ষিত হয় নাই বলিযা তিনি অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেন।" কাজেই জাতীয় চেতনার অনুসরণ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের নাম অবশ্যই স্মরণীয় এবং সেই আঙ্গিকে মাইকেল মধুসূদন উক্ত 'দি ফার্স্ট ম্যান অ্যামোঙ্গ্ আস' সর্বাংশে সত্য।[২২]

অতঃপর আমরা বিদ্যাসাগরের ভারতীয়ত্ব বা জাতীয়তাবোধ চেতনা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা উপস্থিত করব। স্বামীজী তাঁর দেহত্যাগের দুদিন আগে জানিয়েছিলেন, "After Ramakrishna I follow Vidyasagar"... কিন্তু কোন্ অর্থে স্বামীজীর নিকট বিদ্যাসাগর পরম শ্রদ্ধার? নিশ্চয় সংস্কারকরূপে নয়, অবশ্যই মানুষ রূপে...... ভারতীয় রূপে। এই প্রত্যয়ে আমরা নিবেদিতার লেখনী অনুসরণ করতে পারি; নিবেদিতা জানিয়েছেন, "প্রতি দেশের সর্বোত্তম বস্তু স্বামীজীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল কিন্তু তিনি পুরনো হিন্দুই থেকে গিয়েছিলেন; সরল জীবনের সৌন্দর্যে এতই গর্বিত ছিলেন যে, পরিবর্তনের প্রয়োজন স্বীকার করেননি। — 'রামকৃষ্ণের পরেই বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করি আমি'—মৃত্যুর দুদিন পূর্বে বলেছিলেন স্বামীজী। ঐ কথা বলার পরে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বহুবার বলা গল্পটি আবার বললেন: 'কিভাবে সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত ধুতি-চাদর গায়ে, খড়ম ঠক্ঠক্ করতে করতে ভাইসরয়ের কাউন্সিল চেম্বারে হাজির হয়েছিলেন এবং তাঁর বেশবাসে আপত্তি করা হলে তিনি সবিস্ময়ে বলেন,— যদি আপনারা আ-মা-কে না চান, তাহলে আমাকে ডেকেছেন কেন?' স্বামীজী কেন বারবার এ প্রসঙ্গটি তুলতেন? বিদ্যাসাগরের আচরণের মধ্যে—'প্রচণ্ড সংস্কারক', 'একেবারে আধুনিক' ইত্যাদি গৌরব লাঞ্ছিত বিদ্যাসাগরের উক্ত আচরণের মধ্যে যেহেতু তিনি আদর্শ জাতীয়তাবাদীকে আবিষ্কার করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের ঐ উক্তিটি—'কেন আ-মা-কে কি ডাকা হয়নি' — ওর মধ্যে, ঐ মৃদু ধিক্কারপূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে, আত্মমর্যাদা ও দেশমর্যাদার কি অপূর্ব ঘোষণা! বিদ্যাসাগর সেই 'পরানুবাদ পরানুকরণপ্রিয় পরাধীন

ভারতে দাঁড়িয়ে জানিয়েছিলেন—যদি আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে, তা করা হয়নি আমার পোষাককে,—করা হয়েছে আমাকেই। এবং আমি বলতে আমার দেশের আচার-আচরণ, পোষাক সহ আমি মানুষটিকে বুঝতে হবে।" এই কাহিনীটিকে বহুমান দিয়ে স্বামীজী বিদ্যাসাগর সম্পর্কে পরবর্তী বহু বিচিত্র মূল্যায়নের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা এবার অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসুর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করব : "বিদ্যাসাগর আমাদের সমাজে বিচ্ছিন্ন আকস্মিক আবির্ভাব নন। ইতিহাসের গর্ভে ঐতিহাসিক পুরুষেরা জন্ম নেন, এটা কাব্যিক শোনালেও বাস্তব সত্য। বিদ্যাসাগরকে সৃষ্টি করবার মতো শক্তি সমাজের না থাকলে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ঘটত না কদাপি। বিদ্যাসাগর 'ধুতি-চাদর-পবা ব্যক্তিত্বে'—আদ্যন্ত ভারতীয়। কোন মানুষ যদি সামাজিক, রাজনৈতিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, অমনি তিনি বিদেশী হয়ে পড়বেন—এ বড়ই বিস্ময়ের! বিদ্যাসাগর যেহেতু নিজ সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন মানুষের কল্যাণের জন্য—তাই তাঁর থেকে বড় স্বাদেশিক সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে পৌরুষের প্রকাশ বলেছেন—সেই পৌরুষ বিদ্যাসাগরকে আত্মমর্যাদা দিয়েছিল। তারই জোরে তিনি নিজের ভারতীয়ত্ব নিয়ে বিচরণ করতেন। এবং বিবেকানন্দের বিদ্যাসাগর আনুগত্যের মূলে তাঁর এ ভারতীয়ত্ব, যা মনুষ্যত্বের সঙ্গে অবিরোধে অবস্থিত।"[২৪]

প্রতিবাদী চেতনা

প্রতিবাদী চেতনার প্রসঙ্গ। বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কার আন্দোলনে বড়লোক তথা ধনীদের ওপর নির্ভর করে তাঁর আন্দোলনকে সার্থকতার শীর্ষে তুলতে পারেন নি; সে সীমাবদ্ধতা[২৫] নিয়েও বলা যায় বিদ্যাসাগর কখনোই বিশেষাধিকারের পক্ষপাতী ছিলেন না। আমরা দেখেছি এশিয়াটিক সোসাইটির যাদুঘরে অনুপ্রবেশ কালে — সাধারণ জনগণের প্রবেশের (চটিপরে সাধারণ বাঙালীদের প্রবেশ প্রসঙ্গ) অধিকার সীমিত হওয়ায় তিনি তার প্রতিরোধে সোচ্চাব হয়েছেন; তাঁর 'বহুবিধবা বোধ' ও 'বিধবা বিবাহ' সংক্রান্ত সংস্কার ক্রিয়ায় গোঁড়াশাস্ত্র বিচারকদের স্ববিরোধী কার্যকলাপে তিনি তীব্র কটাক্ষ করেছেন এর আরো দৃঢ় প্রতিবাদ কল্পে 'তত্ত্ববোধিনী'-তে 'বিধবা বিবাহ উচিত কিনা' প্রকাশ করেছেন। তাঁর কর্মজীবনেও প্রতিবাদী চেতনার নমুনা লক্ষ্য করা যায়। "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছেড়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের চাকরীতে যোগ দেন, ১৮৪৬-এর ৬ এপ্রিল। সংস্কৃত কলেজের সামগ্রিক সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে, তিনি ঐ বছরই ১৯ সেপ্টেম্বর এক পরিকল্পনা পেশ করেন। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-ভাবনা সংক্রান্ত এটিই প্রথম প্রামাণ্য প্রস্তাব। "আমি যে সব প্রস্তাব করেছি, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংস্কৃত ও ইংরেজি সমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারকে একত্র করে তার ভিত্তিতে বিদ্যার্জন করা। এই শিক্ষালাভ করে যে তরুণেরা বেরিয়ে আসবে, তারা পাশ্চাত্য

জগতের বিজ্ঞান ও সভ্যতার পরিচয় ঘটাতে সক্ষম হবেন আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে।"

সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সম্পাদক রসময় দত্ত বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবে বাধা দিলেন। ১৮৪৭-এর ৩মে বিদ্যাসাগর রসময় দত্তকে যে দীর্ঘ চিঠি লেখেন, তা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে রসময় দত্ত বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-সংস্কার প্রস্তাবকে ধামাচাপা দিয়ে, বানচাল করতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কার-প্রস্তাবের সমর্থনে চাকরী থেকে ইস্তফা দিলেন, সহকর্মীদের সনির্বন্ধ অনুরোধকে অগ্রাহ্য করে। বিদ্যাসাগরের সমস্ত প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থেই এই কাহিনীর উল্লেখ আছে। বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ পত্র পেয়ে রসময় দত্ত নাকি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "বিদ্যাসাগর চাকরী ছাড়লে খাবে কি ?" একথা লোকমুখে শুনে বিদ্যাসাগর উত্তর দিয়েছিলেন, "রসময় দত্তকে বল যে বিদ্যাসাগর বাজারে আলু-পটল বেচে রোজগার করবে, তবু মত বিক্রী করে চাকরী করবে না।"[২৭]

আর একটি ঘটনার বিবরণ জানিয়েছেন সন্তোষ কুমার অধিকারী : "জজ দ্বারকানাথ মিত্রর এজলাসে এক ভ্রষ্টা রমণীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলায় বিদ্যাসাগরের মতামত চাওয়া হয়। প্রচলিত হিন্দু আইনে নারী ভ্রষ্টা হ'লে স্বামীর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হত। বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করলেন যে, এই ক্ষেত্রে ওই রমণী যখন ভ্রষ্টা হন, তখন তিনি স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার পেয়েছেন কিনা। উত্তর হয়, তার অনেক আগে থেকেই তিনি ওই সম্পত্তি ভোগ করছেন। বিদ্যাসাগর মত দিলেন, সম্পত্তির অধিকার একবার কোন বিধবা নারী যদি লাভ করে, পরবর্তী কালে সে ভ্রষ্টা হয়েছে অজুহাতে তাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।" এই ঘটনায় হিন্দু সমাজে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিদ্যাসাগরের জীবনী রচয়িতা সুবল চন্দ্র মিত্র ও মন্তব্য করেন "Vidyasagar wanted in foresight and the whole Hindu community was disappointed in him."[২৮]

আমরা আগেও আলোচনা করেছি বিদ্যাসাগর তাঁর আন্দোলন মুখ্যত উচ্চমধ্যবিত্ত ও বিত্তবানদের ওপর ভিত্তি করেই চালাতে চেয়েছিলেন এবং ব্যর্থতাও সে কারণে অনেকাংশে তাঁকে পীড়িত করেছিল। তবে একথা অনস্বীকার্য যে সাম্রাজ্যবাদী শোষক গোষ্ঠীর দেশীয় তাবেদার যে জমিদারতন্ত্র (যাঁরা মুখ্যত কর্ণওয়ালিশকৃত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণে সৃষ্ট) — তার প্রভাবে প্রভাবিত হন নি। কোন ধনী জমিদারের অনুগ্রহের দান তিনি গ্রহণ করেননি — আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি; সেই সঙ্গে স্মরণ করতে হয় শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকট তাঁর সেই প্রতিবাদী উক্তি, "প্রয়োজন হলে ভারতের যে কোন রাজা-মহারাজার নাকের উপর এই চটি পায়ের লাথি ঠক্ করেই মারতে পারি।"[২৯]

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ পদে আসীন থাকেন ১৮৫১ মে থেকে ১৮৫৮ সেপ্টেম্বর। ১৮৫৪ সালে ইংল্যাণ্ডীয় কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষীয় লোকমণ্ডলীয়

শিক্ষাবিধানের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ উৎসাহে বাংলার বিভিন্ন জেলায় মডেল স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর (১৮৫৮) ইংল্যাণ্ডীয় মন্ত্রীসভার পরিবর্তন ঘটলে ভারতবর্ষীয় শিক্ষানীতির পরিবর্তন ঘটে। তদানীন্তন ছোটলাট ইয়ং সাহেব তখন বিভিন্ন খাতে এদেশের শিক্ষাজনিত ব্যয় সঙ্কোচনে মন দিলেন — বালিকা বিদ্যালয় প্রসারে বাধা এবং সংস্কৃত কলেজে স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপকের পদের বিলোপ ঘটল। এর প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন বিদ্যাসাগর। এই প্রতিবাদী অধ্যায় 'বিদ্যাসাগর-ইয়ং' মসিযুদ্ধ নামে খ্যাত। এর পরিণামী সিদ্ধান্ত হল সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাসাগরের বিদায় গ্রহণ।[৩০]

আধুনিকতা

"বিদ্যাসাগর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য আধুনিকতা। বিদ্যাসাগর মনে করতেন — ইউরোপের আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে গভীর পরিচয় — ভারতের পুনরুজ্জীবনের জন্যে একান্ত আবশ্যক। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার জনিত জড়তা যা ভারতবাসীর জীবনের গতি রুদ্ধ করে রেখেছিল তাকে উপড়ে ফেলে দিতে কৃতসংকল্প ছিলেন। তিনি বলতেন — ইংরেজ জাতির কাছ থেকে ভারতবাসীর শিক্ষার অনেক কিছু আছে — যেমন, নিয়মানুবর্তিতা, সত্যনিষ্ঠা, কর্মোদ্যোগ প্রভৃতি। তাই বালক-বালিকাদের সামনে তিনি যে সমস্ত জীবন চরিতের আদর্শ তুলে ধরেন তার কোনটি তিনি গ্রহণ করেন ইংল্যাণ্ড থেকে, কোনটি ইতালি, কোনটি বা আমেরিকা থেকে। এঁদের কেউ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, কেউ শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, কেউ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কেউ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্।"

পত্রিকা প্রকাশনা আধুনিকতার এক আঙ্গীক। বিদ্যাসাগরের জীবনী অনুসরণ করলে দেখব 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর নিছক সখ্যতা ছিল। "পরাধীন দেশের জনগোষ্ঠীর জীবনে এই ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বলিত সংবাদপত্রের রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। যথার্থ পরিমার্জনা দ্বারা তার বিশিষ্ট চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলার প্রধান কৃতিত্ব তার স্বনামখ্যাত সম্পাদক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'পরম বন্ধু' সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের। সূচনা থেকে শেষ দিনটি পর্যত বিদ্যাসাগর মহাশয় সোমপ্রকাশের সঙ্গে সক্রিয় আগ্রহ নিয়েই যুক্ত ছিলেন।"[৩১]

আধুনিক মানুষ বা Modern Man-কে যে ভাষায় বর্ণনা করেছেন ড্যানিয়েল লার্নার তা হল : "He loves change, new things and experience. And he views the future as something to be created, not inherited from the past. He stands free of tradition and taboo and assumes a calculating attitude toward a manipulable and open future. He is

therefore rational and goal - oriented. He measures success by purity of his faith."[৩২] বাংলা করলে দাঁড়ায় — যিনি আধুনিক মানুষ তিনি পরিবর্তন ভালোবাসেন ; কামনা করেন নতুন নতুন ঘটনা ও অভিজ্ঞতা। ভবিষ্যৎকে তিনি অতীতের প্রতিচ্ছবি রূপে দেখেন না, সৃষ্টির ক্ষেত্র বলে মনে করেন। প্রাচীন সংস্কার ও সামাজিক বাধা নিষেধ থেকে তিনি মুক্ত হয়ে দাঁড়ান ; ভবিষ্যৎকে প্রয়োজনে রূপান্তরিত করা যায় জেনে, তিনি মেপে মেপে পা ফেলেন। বুদ্ধি ও বিচারবোধের ওপর তিনি নির্ভর করেন এবং অন্তিম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। আত্মবিশ্বাসের গভীরতা থেকে নয়, কাজের ফলাফল থেকেই তিনি সাফল্য নিরূপণ করেন।

মানুষকে তার স্বকীয় সংস্কার ও প্রাচীনতা থেকে মুক্ত করে সমাজকে সচল করতে চেয়েছিলেন তিনি। তার পরিচয়ও তাঁর শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্টে পাওয়া যায়। ইংরাজী ভাষাকে অবশ্যপাঠ্য করার ওপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন, তার একটা কারণ, "their requirements in English will enable them to study Modern Philosophy of Europe. Thus they shall have ample opportunity of compairing the systems of philosophy of their own with the new philosophy of the western world."[৩৩]

"উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিবাদ বিদ্যাসাগরকে আলোড়িত করেছিল। ফরাসী বিপ্লবের গতিও তাঁর দৃষ্টিতে বাদ পড়েনি। তাঁর যুক্তি ও বিচার প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হৃদয়ের করুণা ও মনুষ্যত্ব। তাই সমগ্র ইউরোপীর সংস্কৃতির চিন্তাধারা ও চলিষ্ণুতার সঙ্গে তিনি যুক্ত করতে চেয়েছিলেন প্রাচ্য সংস্কৃতির মহত্ত্বকে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এই অনন্য ব্যক্তিত্বের ধারাকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — "যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে। বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে; সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান — কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল ; এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে বিদ্যাসাগর চরিত্রের আধুনিক মানসিকতার রূপ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রাচীন সংস্কারের অন্ধতা ও ধর্মীয় অনুশাসনকে তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘসে' বিচার করেছেন, দেশাচারের কঠিন দেওয়াল ভেঙ্গে সমাজকে মানব চিন্তার পথে ধাবিত করেছেন।"[৩৪]

বিদ্যাসাগরের আগ্রহ ও রুচির মধ্যেও আধুনিকতার ছোঁয়া বর্তমান। তিনি বিভিন্ন বিষয় পঠন পাঠনে বিচিত্র পুস্তক সংগ্রহ করতেন; তার জন্য বিশাল ব্যয় নির্বাহ করতেন এবং সেগুলিকে সযত্নে সংগ্রহ করে রাখতেন তাঁর সাধের গ্রন্থাগারে। এ প্রসঙ্গে সন্তোষকুমার অধিকারীর বিবরণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "বিদ্যাসাগর সচেতন ছিলেন যে, বিশ্বের আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে এ দেশের ছাত্রদের কোন পরিচয় নেই। তাই সংস্কারের কাজে হাত দেওয়ার আগে তিনি প্রাসঙ্গিক বইগুলি কিনেছেন

এবং যত্ন নিয়ে পড়েছেন। তাঁর এই সযত্ন পাঠের ইতিহাস বহন করছে 'সাহিত্য পরিষৎ' ভবনে রক্ষিত তাঁর গ্রন্থগুলি। ইউরোপের ইতিহাস জানতে তিনি কিনেছিলেন, আর্ণল্ড টমাস, আর্কিবোল্ড অ্যালিসন, অ্যাসওয়ার্থ ফিলিপ, জর্জ ব্যাংক্রফ্‌ট, উইলিয়ম স্মিথ ..... প্রমুখ লেখকের বই।

গ্রীক দর্শন ও সাহিত্যের তিনি অনুরক্ত ছিলেন, তার প্রমাণ, অ্যারিষ্টট্‌ল, অ্যারিষ্টোফেন্‌স্‌ থেকে শুরু করে সক্রেটিস্‌, প্লেটো, সফোক্লিস সম্পর্কে আলোচনামূলক বইগুলি তিনি সংগ্রহ করেছেন। সারা ফ্রানসিস অ্যালেনের গ্রীক দর্শনের ইতিহাসের পাশাপাশি কোঁৎ বার্কলে ও মিল-এর বইগুলিও দেখা গেল। ভাষাতত্ত্ব ও বিভিন্ন ভাষায় ইতিহাস তিনি কিনে আনিয়েছেন। ইংরাজী সাহিত্যে সেক্সপীয়ারের সবগুলি নাটক পর পর সাজানো, ইংরাজী কাব্যে সম্ভবত ব্রাউনিং ও এডুইন আর্ণোল্ড তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন। তাঁদের কাব্যগ্রন্থগুলির একাধিক কপি তিন রেখেছেন।

শুধু ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্য সংগ্রহে তিনি উৎসুক ছিলেন, একথা ভাবলেও ভুল করা হবে। গ্রীকদর্শনের পাশাপাশি বৌদ্ধ দর্শনের সংগ্রহ। উপনিষদ ও হিন্দু-দর্শন-এর সঙ্গে আবুল ফজল আল্লামি'র আইন-ই-আকবরি এবং আল রহিমের বাদশানামা। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে তাঁর পঠিত কোরাণ শরীফ এখনো রক্ষিত আছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর 'তালিকামত এই বিদ্যাসাগর সংগ্রহে আছে ৩৪৪৭টি বই; ৩২২টি সংস্কৃত ও হিন্দী এবং ১৯১টি বাংলা; বাদ বাকী সব ইংরেজী।' বাংলা বইয়ের বিবরণ কিছু কিছু পুলকেশবাবু দিয়েছেন। আশ্চর্য বোধ হয়েছে যখন দেখেছি তাঁর ইংরেজী সংগ্রহে শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের আধুনিকতম বইটিও আছে। যেমন, জন লক্‌, জন গ্যাসপার, স্পারজাইম, জে উইলিয়াম, জর্জ কোম্বে, এই ফ্লেচার, স্যার চার্লস হে ক্যামেরণ, স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ান প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌দের বই।"[৩৫]

বিদ্যাসাগরের আধুনিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ বক্তব্য বিশেষ উল্লেখ্য: "বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়।.....তিনি নিজে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথচ তিনিই বর্তমান ইউরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন, এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন,.....বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌরবকে স্বীকার করতে হবে। তিনি নবীন ছিলেন এবং চিরনবীনের অভিষেক লাভ করে বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সবচেয়ে পূজনীয়।"[৩৬]

যুক্তিবাদ ও ব্যবহারিকতা

বিদ্যাসাগর যেমন যুক্তিবাদী তেমনই বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। তাই কি শিক্ষায়, কি সমাজ কর্মে, কি নীতিতে, কি কর্ম প্রণালীতে — সেই ব্যবহারিকতার বয়ান লক্ষিত হয়েছে। সমাজের পুঞ্জিভূত কুসংস্কার ভাঙ্গতেই নেমেছিলেন সমাজ সংস্কারের ভূমিকায়। সে ক্ষেত্রেও তিনি কোন জঙ্গী আন্দোলনপথে নামেন নি। নেমেছেন যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানসিদ্ধ পন্থায়। দেশের ধর্মভীরু মানুষকে ধর্মশাস্ত্রের উদ্ধৃতি তুলে বুঝিয়েছেন যে 'বিধবা বিবাহ' অশাস্ত্রীয় নয় : তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলনকে সুদূর প্রসারী সার্থকতায় পৌঁছাতে 'শিক্ষা বিস্তার'কে এর হাতিয়ার করতে চেয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মিলিত শিক্ষা চেতনায় দেশবাসী কুসংস্কার মুক্ত হয়ে উঠবে। তাঁর এই প্রত্যয় প্রসঙ্গে আমরা বদরুদ্দীন উমরের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি, "এই 'অবিমিশ্র প্রাচ্য শিক্ষার' বিরুদ্ধেই স্থাপিত ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শ। প্রাচ্য শিক্ষাকে বাতিল করে কেবল পাশ্চাত্য ভাষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর মত একটি সমাজ বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায় সৃষ্টির তিনি যেমন বিরোধী ছিলেন তেমনই তিনি কেবলমাত্র প্রাচ্য শিক্ষার মধ্যেই ছাত্রদের শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রেখে কুসংস্কার ও বর্বরতাকে প্রশ্রয় দেওয়ারও বিরোধী ছিলেন। এজন্য ইংরেজি ও বাংলা ভাষা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন, সাহিত্য,, জ্ঞান-বিজ্ঞান এ দুইয়েরই চর্চার মাধ্যমে তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশে নতুন এক সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তি স্থাপন করতে।"[৩৭]

যুক্তিবাদ তাঁর কর্মধারার মাঝেও বিধৃত। "বিদ্যাসাগরের জীবনের ঘটনাবলীর পরম্পরা ও তাৎপর্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়। তিনি রক্ষণশীল চিন্তা বা অন্ধবিশ্বাস থেকে পুরোপুরি মুক্ত থেকে আপন আদর্শ ও লক্ষ্যের দিকে দেশকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ গুণে গুণে ফেলা। যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি আমূল সংস্কার চেয়েছেন ; শিক্ষাপদ্ধতির যেমন পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, পাঠক্রমও তেমনি তাঁর লক্ষ্যের অনুকূল করে সাজিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন, বর্ণ-পরিচয় ও বোধোদয় থেকে শকুন্তলা ও সীতার বনবাস পর্যন্ত। নিজের প্রেসে সেই সব বই ছেপেছেন। বিদ্যালয় যেমন প্রতিষ্ঠা করেছেন, শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রও তেমনি। তাঁর এই পরিকল্পনার চিত্রায়ণ এমনই সম্পূর্ণ ছিল যে, কোনখানে সামান্য কোন বাধা এলেই তিনি তার প্রতিরোধ করেছেন।

'Calculated steps'-ই তাঁর কর্মনীতি। বিদ্যাসাগর আগে শিক্ষা সংস্কারে হাত দিয়েছেন তারপর সমাজ সংস্কারে। নারীর মুক্তির প্রয়াসেও তাঁর হিসেব করে সাজানো প্রত্যেকটি পদক্ষেপ। নারীর শিক্ষার ভিত তৈরী করেছেন যখন, তখনই নিন্দা করেছেন বাল্যবিবাহের। 'বিধবা বিবাহ' আইন হিসাবে গ্রাহ্য করানোর আগেই বলেছেন, বহুবিবাহের অযৌক্তিকতা ও বেদনাময় গ্লানির কথা। আগে শাস্ত্র থেকে যুক্তি তুলে

দেখিয়েছেন, তারপর আইন। এবং তারও পরে নিজের একমাত্র পুত্রের বিবাহ বিধবার সঙ্গে দিয়েছেন।"[৩৮]

সাংগঠনিক চেতনা

সাংগঠনিক চেতনা ব্যক্তির বৈজ্ঞানিক ভাব ভাবনার সঙ্গে বিশেষ সংশ্লিষ্ট। সমাজ সংস্কার শিক্ষাবিস্তার সংশ্লিষ্ট তাঁর অভিযানগুলি সাংগঠনিক চিন্তার দ্যোতক। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ রোধ কল্পে লেখনী ধারণ ও জনমত গঠনে তাঁর নিরলস পরিশ্রম বাঙালী আজীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। শিক্ষাবিস্তার উদ্যোগেও তাঁর এই প্রবণতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অবৈতনিক বিদ্যালয়, মডেল স্কুল এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে তিনি তাঁর সাংগঠনিক চিন্তার উজ্জ্বল সাক্ষর রেখে গেছেন।

বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনার তাঁর অক্ষয় কৃতিত্ব জড়িয়ে আছে বেথুন স্কুল ও মেট্রোপলিটন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি যখন বেথুন প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক ও সংগঠক হলেন (১৮৫০) তখন ঐ বিদ্যালয় পরিচালনায় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন; ছাত্রী সংগ্রহ ও বিদ্যালয় পরিচালনা দুই-ই তিনি লক্ষ্য রাখতেন।

ক্যালকাটা 'ট্রেনিং স্কুল' যখন ব্যবস্থাপনায় কর্মশক্তিহীন তখন ঐ বিদ্যায়তনের পরিচালনবর্গ বিদ্যাসাগরের ওপর সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পন করেন (১৮৬১)। নিজ কর্মৈষণা দিয়ে তিনি ঐ বিদ্যালয়কে করলেন মেট্রোপলিটন স্কুল (১৮৬৪), তারপর তাকে ডিগ্রি কলেজে—'মেট্রোপলিটন কলেজ'-এ (১৮৭৩) (যা বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) উন্নীত করলেন। তাঁর কৃতিত্ব সেইখানেই যে, তখন কলকাতায় কেবল সরকারী ও মিশনারী কলেজ, কোনো বেসরকারী কলেজের অস্তিত্ব ছিল না; মেট্রোপলিটনই বাঙালী পরিচালিত প্রথম বেসরকারী কলেজ। এই কলেজ স্থাপনেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না; এর শিক্ষার মান যাতে উৎকৃষ্ট হয় সেদিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলেন; এই কলেজের বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে ছাত্রদের উত্তীর্ণ হওয়া, এই কলেজে 'বি-এ অনার্স, এম-এ ও আইন পড়ার' অধিকার অর্জন করা এবং এই কলেজে অধ্যাপনার জন্য এন.এন. ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকদের সংগ্রহ করে আনার ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগরের উজ্জ্বল সাংগঠনিক কৃতিত্ব চিহ্নিত হয়ে আছে।[৩৯]

আমরা আগেও উল্লেখ করেছি তাঁরই পরিচালনায় এদেশে বিভিন্ন জেলায় (নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর) মডেল স্কুল স্থাপিত হয়েছে। বালিকা বিদ্যালয় সংগঠনও তাঁর পরিশ্রমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; বীরসিংহ ও কার্মাটাডে 'নাইটস্কুল' স্থাপন, পরিচালনা ও তার অর্থনৈতিক দায়ভার তার বিশেষ সাংগঠনিক মানসিকতার পরিচায়ক।[৪০]

'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফাণ্ড' অর্থাৎ দুঃস্থ অসহায় নারীর জন্য বীমাব্যবস্থা, — যা ভারতবর্ষে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭২ সালে। এ জাতীয় ব্যবহারিক পরিকল্পনায়ও বিদ্যাসাগর সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, 'স্বল্প আয় সম্পন্ন বাঙালী মৃত্যুকালে তাঁর বংশের ব্যক্তিগণ যাতে নিয়মানুগ কিছু বৃত্তি পেতে পারে সেই কারণে রোজগারী ব্যক্তিকে মাসে এই ফাণ্ডে কিছু অর্থ (দু টাকা চার আনা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত) লগ্নী করতে হবে; এবং এই উদ্যোগেই ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্ম ও বিদ্যাসাগরের ট্রাস্টি পদে অধিষ্ঠান।"[৪১]

বিদ্যাসাগরের সাংগঠনিক মানসিকতার আর এক দৃষ্টান্ত দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন। গ্রামে চিকিৎসার অভাব অনুভব করেই চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং সে দায়ভার নিজের ঘাড়েই তুলে নিয়েছেন। তাঁর বিপুল ব্যস্তময় কর্মজীবনে শিক্ষা সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের মধ্যেও চিকিৎসার ব্যবস্থায় অধিক যত্নবান হয়েছেন। বর্ধমানে, কার্মাটারে ও মেদিনীপুরে (বীরসিংহ) তাঁর চিকিৎসালয় স্থাপন উদ্যোগ তার চরিত্রের বিশিষ্টতার এক দিক।

আমরা আরো বিস্মৃত হই, যখন দেখি, বিদ্যাসাগর তাঁর সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাণপ্রাচুর্য অব্যাহত রাখার জন্য তিনি অত্যন্ত ভাবিত। তাঁর উইলে তাঁর সঞ্চিত অর্থের বরাদ্দভিত্তিক অর্থ বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও দুঃস্থ অনাথদের জন্য ব্যয়ের নির্দেশ দিয়ে গেছেন :

"আমি অবিদ্যমান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যে অনুষ্ঠানে যেরূপ মাসিক ব্যয় হইবেক তাহা নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে।

১) জন্মভূমি বীর সিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয় — ১০০ একশত টাকা।

২) ঐ গ্রামে আমার স্থাপিত চিকিৎসালয় — ৫০ পঞ্চাশ টাকা

৩) ঐ গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোক — ৩০ ত্রিশ টাকা

৪) ...বিধবা বিবাহ — ১০০ একশত টাকা""[৪২]

আত্মমর্যাদাবোধ

আত্মমর্যাদাবোধ বিজ্ঞানমনস্কতার একটি বিশেষ লক্ষণ। এই বৈশিষ্ট্যে বিদ্যাসাগর একক ও অদ্বিতীয় বাঙালী।

সমকালে ইংরেজরা এদেশীয়দের যেমন অবজ্ঞা করত তেমনি এক ঘৃণার মনসিকতাও সেখান থেকে নির্গত হত— যেহেতু এদেশীয় ব্যক্তিগণ সাহেবী চাল চলনে অপটু ... দেশীয় সংস্কৃতি মানুষ শিক্ষায় পারদর্শী নয়। বিদ্যাসাগর এই মানব ঘৃণাকে মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। দেশীয় লোকের অপমানকে তিনি নিজের অপমান বলেই ধরতেন। সেই কারণে তিনি চাইতেন না দেশীয় ব্যক্তিরা সাহেবদের কাছে অকারণে অনুগ্রহ প্রার্থনা করুক। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের বিবরণ ক্রমে, সে সময় সাহেবদের নিকট দেশীয় লোকেরা উপযাচকরূপেই বেশী যেতেন ; আত্মমর্যাদা

ও জাতীয় মর্যাদার কথা তাঁদের স্মরণেও থাকত না, তা রক্ষা করা তাঁদের সাহসেও কুলোত না। এসব লোকের সংস্পর্শে এসেই সাহেবরা (যেমন সম্ভবত মেকলে) বাঙালী চরিত্র সম্বন্ধে অবজ্ঞা-ভাব পোষণ করতে অভ্যস্ত হত। শোনা যায়, ছোট লাট হ্যালিডের নিকট দেশী হোমরা চোমরারা অনুযোগ করেছিলেন — আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসে কতক্ষণ অপেক্ষা করি ; অথচ বিদ্যাসাগর এলেই আপনি তাঁকে ডেকে পাঠান। হ্যালিডে উত্তরে বলেছিলেন, "আপনারা আসেন আপনাদের গরজে, বিদ্যাসাগরকে আমি চাই আমার গরজে।"[৪৩]

বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদা বোধ সম্পর্কিত আর একটি বিশেষ ঘটনা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ কারসাহেবের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের প্রসঙ্গ। 'বিদ্যাসাগরকে একবার কার সাহেবের সঙ্গে তাঁর কক্ষে দেখা করতে যেতে হয়। সাহেব তাঁকে বসতেও বলেন না, টেবিলের উপর জুতাশুদ্ধ পা তুলে রেখেই কথা চালান। বিদ্যাসাগর স্থির মর্যাদায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজের কথা বলে চলে আসেন। পরে একদিন সাহেবকে আসতে হল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে বিদ্যাসাগরের কক্ষে। বিদ্যাসাগরও তাঁকে বসতে বললেন না, তালতলার চটি পরা পা টেবিলের উপর তুলে দিয়ে কথা চালালেন। সাহেব অপমানিত হন, চটে গিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ করেন। বিদ্যাসাগর জবাব দেন— সাহেবের আচরণ থেকেই তিনি বুঝেছিলেন— ওরূপই সভ্য আচরণ. আর সাহেবের সঙ্গে তাই সেরূপ আচরণই তিনি করেছেন। বিদ্যাসাগর মাথা নোয়াবেন না, কর্তৃপক্ষ জানতেন। না, সাহেব দেখলেও মেরুদণ্ড বেঁকে যাবার মত মানুষ বিদ্যাসাগর নন।[৪৪]

কেবল সাহেবই নয়, ধনী বা ক্ষমতাবানদের নিকট আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হতে দিতেন না। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন, "আমি তখন অনুভব করেছিলাম এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনই ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরাও নগণ্য ব্যক্তির মতো।"[৪৫]

এ প্রত্যয় অহংকার বা উগ্রতার সমতুল নয়— এ চারিত্রিক দৃঢ়তা। তিনি সাহেবদের অনেকের সদ্‌গুণের জন্য তাঁদের গুণগ্রাহী ছিলেন, রাণী স্বর্ণময়ী প্রভৃতির মতো কোন কোন বঙ্গীয় জমিদারের গুণের জন্য তাঁদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দের সম্পর্ক ছিল। মনুষত্বের মর্যাদাবোধেই তিনি মানুষকে দিতেন মর্যাদা— ক্ষমতার ভয়ে নয়, পদগরিমায়ও নয়। বড়লোক, ধনীলোকের থেকেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে দোকানে বসে তামাক খেতে .... গল্প করতে ছিল তাঁর সহজ আনন্দ। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তা দেখে লজ্জা পান, পরে রাজা বিদ্যাসাগর কে অনুযোগ করেন কেন তিনি ঐ অবস্থায় ছিলেন ? বিদ্যাসাগর দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ওসব সাধারণ মানুষই তাঁর আপন জন। যতীন্দ্রমোহন লজ্জিত হন।

কেবল ব্যক্তিগত মর্যাদা সংরক্ষণই নয় — কোন মানবাত্মার মর্যাদার অপমান তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এর বিস্ময়কর নমুনা রয়েছে সংস্কৃত কলেজে জনৈক

শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রদের শাস্তিদান কালে তাঁর হস্তক্ষেপে: 'একদিন তিনি দেখিতে পান, সংস্কৃত কলেজের কোন অধ্যাপক, ক্লাসের ছেলেগুলিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অধ্যাপককে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটু রহস্য করিয়া বলিলেন,— "কি হে! তুমি যাত্রার দল করিয়াছ না কি? তাই ছোকরাদিগকে তালিম দিতেছ? তুমি বুঝি দূতী সাজিবে।"'[৪৬]

আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায় যা উল্লিখিত প্রত্যয়কে পুনরায় ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে উদ্ভাসিত করবে: 'বিধবা-বিবাহ আন্দোলন করতে গিয়ে বহু অর্থব্যয় করে বিদ্যাসাগর বিপুল ঋণজালে আবদ্ধ হয়েছেন, এই খবর শুনে তাঁর গুণমুগ্ধ, সঙ্গতিপন্ন কয়েক জন বিশিষ্ট বাঙালি 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ চিঠি লিখে তাঁকে ঋণমুক্ত করার জন্য এক তহবিল সংগ্রহ অভিযান শুরু করেন। কয়েকদিনের মধ্যে বিদ্যাসাগরের একটি চিঠি 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ছাপা হল, যাতে তিনি তাঁর বন্ধুদের ঐ তহবিল সংগ্রহ অভিযান বন্ধ করতে বলে লিখেছেন যে, অশেষ পরিতাপের কথা যে আমাদের বন্ধুরা এখনও ব্যক্তিকে সাহায্য ও একটা জনহিতকর কাজকে সাহায্যের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখেন নি। আমাকে 'ঋণমুক্ত করার চেষ্টা না করে , তাঁরা যদি বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য জনমণ্ডলীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন তাহলে দেশ ও সমাজের অনেক বেশী উপকার হত।'[৪৭]

ত্যাগ ও তিতিক্ষা

ত্যাগ, মানবিক চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। বিদ্যাসাগরের জীবন অকুণ্ঠ দানে গরীয়ান তেমনই কঠিন কঠোর ত্যাগে অগ্নিদগ্ধ। এই পুরুষকার অতিবড় যন্ত্রণায় নির্বিকার ও নীরব। আমরা তাঁর জলন্ত ত্যাগের কয়েকটি নমুনা উপস্থাপন করব।

প্রথমেই স্মরণ করতে হয়— তাঁর কর্ম জীবনে তিনি একাধিক চাকুরীতে ইস্তফা দিয়েছেন (ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরিতে ইস্তফা দান ১৮৪৬ সালে; সংস্কৃত কলেজের চাকুরিতে ইস্তফা ১৮৪৭ সালে; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও ট্রেজারার'-এর পদ থেকে ইস্তফা দান ১৮৫০ সালে; সংস্কৃত কলেজে প্রথমে সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে (১৮৫০) ওপরে অধ্যক্ষ পদে (১৮৫১) কৃত হওয়া এবং ঐ পদে ইস্তফা দান ১৮৫৮ সালে) এবং কর্মজীবনের বিচ্ছিন্নতার জন্য অর্থনৈতিক ক্ষতিকে বরণ করে নিতে হয়েছিল স্বচ্ছন্দে।[৪৮]

সর্বোপরি তাঁর ত্যাগের ক্ষেত্র তাঁর সাধনা— এদেশে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন। তিনি নিজেই বলেছেন, "বিধবা বিবাহ-প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।"[৪৯] বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করতে গিয়ে তাঁকে অনেক অর্থ ও শ্রম ত্যাগ করতে হয়েছিল — লাভালাভের মূল্যে তার কোন হিসাব হবে না, দেনার দায়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সাধের ছাপাখানাটিও তাঁকে বিক্রি করতে হয়েছিল।

ভ্রাতৃবর্গ, আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের পিছনে অকাতরে অর্থদান করেও পরিণামে তিক্ততা ও নিন্দার ভাগীদার হয়েছেন ; ভাববার বিষয় কী নির্মোহ সংযম! মনোবেদনায় একবার বলেই ফেলেছিলেন : "সন্তুষ্ট কাহাকেও করিতে পারিলাম না।"[৫০]

তাঁর প্রিয় জন্মভূমি বীর সিংহও তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। ১৮৬৯ সালে তিনি বীরসিংহ উপস্থিত থাকাকালে 'মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ক্ষীরপাই নিবাসী এক ব্যক্তি কাশীগঞ্জ নিবাসী মনোমোহিনী নামক এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহের পরিকল্পনায় বীরসিংহে তাঁর আশ্রয়ে আসে। এ সংবাদ অবগত হয়ে ঐ যুবকের আত্মীয়বর্গ বিদ্যাসাগরের কাছে আকুল প্রার্থনা জানায় যাতে বিধবার সঙ্গে মুচিরামের বিবাহ স্থগিত হয়। আত্মীয়বর্গের কাতর অনুনয়ে বিদ্যাসাগর সম্মতি জানিয়ে তাঁদের শান্ত করে ফিরিয়েছিলেন। অথচ সেই রাত্রে তাঁর অগোচরে বিদ্যাসাগরের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের ব্যবস্থাপনায় ঐ বিবাহ সম্পন্ন হয়। পরের দিন বিদ্যাসাগর যখন বিষয়টি অবগত হলেন — তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যেহেতু তিনি কথা দিয়েছেন বিবাহ হবে না এবং সে কথা রাখতে পারেন নি— কাজেই আর তিনি বীরসিংহ আসবেন না।' ফলতঃ তাই হয়েছিল। সত্যরক্ষার্থে — বিদ্যাসাগর তাঁর প্রিয় জন্মভূমি চিরকালের জন্য ত্যাগ করলেন।"[৫১]

সত্য ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি কঠোর আনুগত্য এবং মিথ্যার সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রামে তাঁকে বন্ধু আত্মীয় পরিজন হতে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে হয়েছিল। এ বড়ই কঠোর ত্যাগ! 'আবাল্য সুহৃদ্ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছিল। মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতাও পরবর্তীকালে বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানে মলিন হয়; কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধে মামলায় প্রবৃত্ত হন; আস্থাভাজন ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রও তাঁর কম মনোব্যথার কারণ হননি। একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে 'যথেচ্ছচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ' বর্ণনা করে তাঁকে বর্জন করলেন এবং তাঁর সম্পত্তির অধিকার থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করলেন।"[৫২]

তাঁর জীবনের এই ত্যাগ এবং পরিশেষ নিঃসঙ্গতার পরিপ্রেক্ষিতে কেবল একটি কথাই স্মরণ হয় যা স্বামী বিবেকানন্দ বজ্র দৃঢ় কণ্ঠে বলতেন, "সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা চলে না।" বিদ্যাসাগর দানের জন্য 'দয়ার সাগর' রূপে চিহ্নিত কিন্তু 'ত্যাগের সাগর' উপাধীতেও তাঁকে সমমাত্রায় ভূষিত করা যায়।

পরার্থপরতা

বিদ্যাসাগরের পরার্থপরতা নজির বিহীন। কেবল এ প্রত্যয়েই তথ্য সমূহের উপযুক্ত সংগ্রহ থাকলে আকারগ্রন্থের দাবী রাখে। বিদ্যাসাগরই একক ব্যক্তিত্ব যিনি কেবল দান করেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর এই মহতী মানবগুণে তিনি 'দয়ার সিন্ধু', 'করুণা সিন্ধু' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত হয়েছেন — তথাপী এই সাধুবাদে এ জাতীয় কষ্টকর — সংগ্রামকে চিত্রিত করা যায় না। আমরা সংক্ষেপে সেই বিরাট সংগ্রামময়

ইতিহাসের দু একটি নমুনা উপস্থাপন করব।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পরদেশে অবস্থানরত কবি মধুসূদন দত্তের প্রতি তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা। কবি বিদ্যাসাগরকে ফ্রান্সের ভার্সোলিন নগর থেকে চিঠিতে (১৮৬৪) জানালেন, 'প্রিয় সুহৃদ্, আমার দৃঢ বিশ্বাস, আপনি শুনিয়া চমকিত ও গভীর দুঃখে অভিভূত হইবেন যে, দুই বৎসর পূবে উচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে আপনার নিকট যে ব্যক্তি বিদায় লইয়াছিল, আজ এই ক্ষণে আমি সেই সবলকায় ও প্রশান্ত চিত্ত ব্যক্তির ভগ্নাবশেষ মাত্র এবং কয়েকজন লোকের নিষ্ঠুরতা, বোধাতীত নির্মম ব্যবহারের জন্য আমি ভীষণ দুর্বিপাকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি... আমি অর্থাভাবে এ দেশীয় কোনো কারাগারে যাইতেছি, আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা কোন অনাথ আশ্রমে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইবে।... আপনাকে যে ক্লেশ দিতেছি, সে জন্য কি ক্ষমা প্রার্থনা করিব? আমি তাহা আবশ্যক বোধ করি না; কারণ আপনাকে বেশ জানি ও সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, একজন বন্ধু ও স্বদেশীয়কে আপনি এরূপ দুর্দশা গ্রস্ত হইয়া মরিতে দিবেন না।'[৫৩] এই চিঠির পর বিদ্যাসাগর কি চুপ থাকতে পারেন। সে সময় অসচ্ছলতার চূড়ান্ত সীমায়, ঋণজালে জড়িত, অভাব ও অনটনের মধ্যে বহুকষ্টে দিন যাপন করছেন, তথাপি তিনি আগালেন মধুসূদনের সাহায্যের উদ্যোগে। পরিশেষে নিজের ঋণ বাড়িয়েই অনাহার ক্লীষ্ট মধুসূদনকে পাঠালেন অর্থ। শুধু একবার নয়... বহুবারই বিদ্যাসাগরকে অর্থ পাঠাতে হয়েছে। এবং এদেশে প্রত্যাবর্তন করলেও সে ধারা অব্যাহত ছিল।

বিদ্যাসাগরের এই সহৃদয়তা তাঁর শৈশব জাত। "বিদ্যালয়ের সহকারীদিগের অভাব মোচনে, তাদের পীড়াতে চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজন হলে সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকতে তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন। বাল্যকাল হতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি যে কত শত শত রোগীর শয্যা পাশে নিশি যাপন করেছেন তার সংখ্যা গণনা করা যায় না। দুরন্ত বালক এইভাবে সহৃদয় ও সেবাপরায়ণ যুবকে পরিণত হন, সহৃদয় ও সেবাপরায়ণ যুবক ক্রমে একবিশ্বব্যাপী উদারতার চরম আদর্শে পরিণত হয়েছিলেন।"[৫৪]

বিদ্যাসাগর জীবনীকার চণ্ডচরণের উল্লেখ অনুসারে অবগত হওয়া যায়, '১৮৬৭ সালে (১২৭২ বঙ্গাব্দে) অনাবৃষ্টি জনিত মন্বন্তরে যখন চারদিক হাহাকার ধ্বনি, একমুষ্ঠি অন্নের জন্য স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধ লালায়িত; অন্নাভাবে লতাপাতা ও বৃক্ষমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করতে করতে শেষে যখন অনাহারে প্রাণত্যাগ করতে লাগল... উড়িষ্যা ও বাঙ্গলার দক্ষিণ অঞ্চলের লোক অত্যধিক বিপন্ন হয়ে বিদেশে অতি দূর দেশে গিয়ে পড়ছিল,... এই দুর্দিনে বঙ্গবীর মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র যথা সর্বস্ব ব্যয় করে দীন দুঃখীর ক্ষুধানল নির্বাণ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রথমত নিরন্ন প্রজামণ্ডলীর দারুণ অভাবের প্রকৃত বিবরণ রাজকর্মচারীদের গোচর করে এবং তার মাধ্যমে রাজপুরুষদের দ্বারা দুঃখনিবারণের চেষ্টা করতে লাগলেন।' মন্বন্তর কালে বিদ্যাসাগরের নিরলস শ্রম, অর্থব্যয় ও সহযোগিতার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে করে

ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সি. টি. মনট্রিসর জানালেন, "বাংলার মন্বন্তরে হুগলী জেলার দরিদ্র জনগণের অভাব মোচনে নানা বিধ সাহায্যের জন্য গভর্ণমেন্ট আপনার নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।"[৫৫]

কেবল এখানেই সমাপ্ত নয় শূদ্রজাতীয় ব্যক্তিদের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেই কারণে তিনি নিজেই দুঃখিনীদের মাথায় তেল মাখিয়ে দিতেন। হাড়ি, ডোম প্রভৃতি ইতর জাতীয় ব্যক্তিদের কেউ ছুঁত না, বিদ্যাসাগর নিজেই তাঁদের যত্নে আগিয়ে এসেছিলেন। এতো গেল শতকের ছ-এর দশকের ঘটনা। এরপর তিনি যখন খর্মাটাড়ে, তখন তিনি নিকটস্থ দরিদ্র সাঁওতাল পল্লীর উন্নতি বিধানে সদা সচেষ্ট থাকতেন, যখনই তিনি বর্ধমান থেকে খর্মাটাড়ে যেতেন ঐ সাঁওতালদের জন্য সীতাভোগ, রসগোল্লা, খেজুর প্রভৃতি নিয়ে যেতেন। কেবল খাদ্য সরবরাহই নয়, তাদের পরিধানের জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে পোশাক আশাক কিনে নিয়ে গিয়ে বিতরণ করতেন। তাদের জন্য খর্মাটাড়ে তিনি নৈশ বিদ্যালয় ও একটি চিকিৎসা কেন্দ্রও স্থাপন করেছিলেন। খর্মাটাড়ে সাঁওতালদের প্রতি তাঁর দয়ার অপূর্ব চিত্র তুলে ধরেছেন বিহারীলাল তাঁর গ্রন্থে, "কর্ম্মাটাঁর সাঁওতালরা ক্রমে তাঁহার আত্মীয় অপেক্ষা আত্মীয় হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগরের করুণা মর্ম্ম তাহারা বুঝিয়া লইল। কেহ দাদা, কেহ বাবা, কেহ জেঠা ইত্যাদি রূপে সম্পর্ক পাতাইল। জীর্ণ, পর্ণ কুটীরময় মলিন সাঁওতাল মণ্ডল বিদ্যাসাগরের করুণাস্রোতে প্লাবিত হইল। বিদ্যাসাগর শীতের সময় সাঁওতালদিগকে চাদর ও কম্বল বিতরণ করিতেন। সে সময় যে ফল, সর্ব্ব সুরসবঞ্চিত দরিদ্র সাঁওতাল, বিদ্যাসাগরের প্রসাদে তাহার রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইত। বস্ত্র নাই, বিদ্যাসাগর বস্ত্র দিতেন, অন্ন নাই অন্ন দিতেন, যাহা নাই তাহাই দিতেন। সাঁওতাল প্রবল পীড়ায় শয্যাগত, বিদ্যাসাগর তাহার শিয়রে বসিয়া মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতেন, হাঁ করাইয়া পথ্য দিতেন, উঠাইয়া বসাইয়া মলমূত্র ত্যাগ করাইতেন, সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতেন। বিদ্যাসাগর যেখানে, সেইখানেই প্রেম ও করুণা।"[৫৬]

মেট্রোপলিটন কলেজ বিনা বেতনে বহু ছাত্রকে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। ছাত্ররা যে, যে অবস্থায় যে রকম সাহায্য চেয়েছে— তিনি তাকে সেই রকম সাহায্যই করেছেন, কাউকে দিয়েছেন বেতন, কাউকে পুস্তক, কাউকে বা পোষাক, কায়ো বা ভরণ পোষণেরও দায়িত্ব দিয়েছেন।

যে কোন দায়গ্রস্ত ও অভাবী জনগণ তাঁর কাছে প্রার্থী হলেই তিনি সাধ্যমত দান করতেন। পিতৃমাতৃ দায়গ্রস্ত ব্যক্তি, কন্যাদায় গ্রস্ত পিতা, বিপদাপন্ন দুঃস্থ সকলেরই ছিল তাঁর কাছে মুক্ত দ্বার। তিনি যাহার যেরূপ অভাব বুঝিতেন, তাহাকে সেই রূপ দান করতেন। তাঁর দানে জাতি বা সম্প্রদায় বিচার থাকত না। দরিদ্র মুসলমানও তাঁর কাছে বিশাল সাহায্যে গুরুতর দায়মুক্ত হয়েছে। বর্ধমান থেকে বীরসিংহ গমন কালে তাঁর পালকীর কাছে ছুটে আসা দুঃস্থ বালক বালিকাদের তিনি পয়সা, মিঠাই, বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতেন।

তাঁর দানের এক বিশেষ ঘটনা স্মরণ প্রয়োজন। এক দুঃস্থ বালককে পয়সা

দেওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোকে যদি এক পয়সা দিই কি করবি ?
সে উত্তর দিয়েছিল— খাবার খাব।

প্রশ্ন : যদি দু পয়সা দিই।

উত্তর : এক পয়সার আজ আর কাল এক পয়সার খাব।

প্রশ্ন ; যদি চার পয়সা দিই।

উত্তর : হাটে আঁব কিনে গাঁয়ে বেচে দু'আনা করবো, লাভের পয়সায় খাব। আসল পয়সায় আবার কেনা বেচা করব। বিদ্যাসাগর খুসি হয়ে তাকে এক টাকা দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য সেই দানে সে উন্নতি করেছিল— সে একটি দোকান গড়ে তুলছিল ভবিষ্যতে। বিদ্যাসাগর সে দোকান দেখে আনন্দাপ্লুত হয়েছিলেন।"[৭]

মূল্যবোধ ও মানবিকতা

আমরা বিদ্যাসাগর চরিত্রের মূল্যবোধ প্রসঙ্গে আলোচনা করব। সত্যবাদতা, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্য পরায়ণতা, শ্রদ্ধাবোধ, দয়া মায়া, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি অসংখ্য মানবিক গুণের সমাহার ছিলেন তিনি। তাঁর কাছে মূল্যবোধ ছিল মানবকেন্দ্রিক। তাঁর মতাদর্শ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, "বিদ্যাসাগর সেই শাক্যমুনি প্রদর্শিত বৈরাগ্য মার্গের ও কর্ম্মমার্গের পথিক ছিলেন। তিনি যে মার্গে চলিতেন তাহা আর্য শাস্ত্র সম্মত সনাতন ধর্ম্মমার্গ।"[৫৮]

ভারতীয় আদর্শের দয়া ও ত্যাগ বিদ্যাসাগর তাঁর স্বীয় জননীর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। "বিদ্যাসাগর তাঁর বহুকথিত আত্মমর্যাদা — 'নিস্তেজ' ভারতীয় রক্ত, এবং 'অধঃপতিত' ভারতীয় সমাজ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে 'মাতার পুত্র' বলেছেন। বিদ্যাসাগর সৃষ্টিতে তাঁর মাতার দান ভুললে চলবে কি করে ? তাঁর জীবনে করুণার দেবী ভুললে চলবে কি করে ? তাঁর জীবনে করুণার দেবী রাইমণির প্রভাব নেই ? সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্বশীলতা এবং পরার্থপরতা কি তিনি দেখেন নি মায়ের বড়মামা রাধাভূণে বিদ্যাভূষণের মধ্যে ? এবং বিদ্যাসাগরের আদর্শ পুরুষ কি ছিলেন না তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ? প্রচণ্ড পৌরুষের প্রতিমূর্তি সেই বিরাট মানুষটির বন্দনায় কি 'বিদ্যাসাগর তাঁর সর্বোচ্চ বাণীকে উৎসর্গ করেন নি ? তাঁরই আদলে কি বিদ্যাসাগরের নিজ মূর্তি গঠিত ছিল না ?"[৫৯]

বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিচারে মানুষেব কাজের তুলনায় চরিত্রের স্থান অনেক উঁচুতে, অন্ততঃ স্বামীজীর দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন অনুরূপ ছিল। স্বামীজীর প্রত্যয় অনুসারে মন্তব্য করা যায় বিদ্যাসাগর 'গভীর ভাবে আধ্যাত্মিক' ছিলেন।

আমরা বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত 'পোশাকী মতবাদ' (অজ্ঞেয়বাদী সংস্কারক) মধ্য হতে মানবিক চেতনায় নিটোল আধ্যাত্মিক বিদ্যাসাগরের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হব। এবং এই সীদ্ধান্তে আমরা অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর লেখনী অনুসরণ করলাম, "যন্ত্রমানব ভেবে অত্যন্ত আধুনিক দায়িত্বশীল নর-বিগ্রহ বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ

করলে বিদ্যাসাগর চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ণ অসম্পূর্ণ হবে, বোঝা যাবে না তাঁর পিতামহ বন্দনার কারণ; বোঝা যাবে না পত্নী ও ছয়পুত্রকন্যা বর্জন করে সংসার ত্যাগের উৎস! ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মানসিক বিচ্ছেদ দেখাবার কার্যে নিরত ব্যক্তিরা ভুলে যান— প্রভৃত শেক্সপীয়ার অধ্যয়নের পরেও পৌরাণিক হিন্দু সভ্যতার মহাকবি কালিদাস বিদ্যাসাগরের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কবি। বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সফল করবার জন্য যথাসর্বস্ব পণকারী বিদ্যাসাগর যখন ঐ সকল লেখকদের রচনাগুণে ভোগসমর্থক মানুষরূপে প্রতীয়মাণ হন, তখন উল্টোদিকে আমরা দেখি তিনি নিজ জীবনে কেবল ত্যাগ (যার আধুনিক প্রতিশব্দ 'আত্মনিগ্রহ') করে গেছেন। বিদ্যাসাগরের আদর্শ মানুষেরা— ত্যাগেরই বিগ্রহ, ভোগের নয়। তাঁর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নারীচরিত্র সীতা। সীনার বনবাসের' শেষে তিনি লিখেছেন: "সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন। তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখনো কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতিপরায়ণতা গুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন যে, বোধহয় বিধাতা মানবজাতিকে পতিব্রতাধর্মে উপদেশ দিবার নিমিত্তে সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্বগুণসম্পন্না পতি পাইয়া কখনো কোন কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন পতি পাইয়া কখনো কোন কামিনী তাঁহার মতো দুঃখভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।"

কী কাণ্ড! বিদ্যাসাগরের কাছে সর্বকালে পৃথিবীর সর্বোত্তমা নারী হলেন— পতিব্রত্যধর্মের প্রতিমা— যিনি ত্যাগ ও আত্মনিগ্রহকে বরণ করেই মহিমান্বিতা!! এইখানেই বিদ্যাসাগরকে দর্শন করতে হবে। তিনি যখন বিধবা বিবাহ আন্দোলন করেছেন, তখন বিধবাদের ধরে ধরে ছাদনাতলায় হাজির করবার জন্য তা করেন নি; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। মনুষ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত বিধবাদের বিয়ে করার স্বাধীনতা দাবি করে তিনি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই লড়াই করেছেন। বিদ্যাসাগর অবশ্যই মানুষের স্বাভাবিক দেহধর্মকে অনুচিত মনে করতেন না, কিন্তু একইসঙ্গে তাঁর হৃদয়ে পূজাবেদী নির্মিত ছিল ত্যাগ তপস্যার প্রতিমাদের জন্য। বিবেকানন্দ এই দিক দিয়েই বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন। দেখেছেন তাঁর ত্যাগ, প্রেম ও সংগ্রামকে। এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অকুণ্ঠ চিত্তে তা স্বীকার করে বলেছেন:

"উত্তর ভারতে আমার বয়সের একজন লোকও নেই, যার উপরে তাঁর ছায়া না পড়েছে।"

"There is not a man of my age in Northern India, on whom his shadow has not fallen."

এই সঙ্গে যোগ করে দিয়েছিলেন: "কি গভীর উল্লাস বোধ করি যখন ভাবি, এই দুই ব্যক্তি— রামমোহন ও বিদ্যাসাগর — এবং শ্রীরামকৃষ্ণ। অল্প কয়েক মাইল ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।" পাঠকদের কেবল একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেব,

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপবিত্র নামের সঙ্গে স্বামীজী অন্য কোন নাম কখনই যুক্ত করতেন না, যদি না গভীর শ্রদ্ধাভাজন হতেন সেই ব্যক্তি। আমি বিবেকানন্দের দিক দিয়েই ব্যাপারটাকে দেখছি।"[৬০]

বিদ্যাসাগরের ত্যাগ, দয়া মায়া ও মমতার উজ্জ্বলমূর্তি আধ্যাত্মিক আদর্শে গরিয়ান ভারতীয় ঋষির ও বাৎসল্যরসে ভরপুর ভারতীয় জননী হৃদয়বত্তার সঙ্গেই তুল্য হতে পারে। এই প্রত্যয়ের ঋজুনিশানা দিয়ে গেছেন কবি মাইকেল মধুসূদন। অভাব, দুঃখ, প্রতারণাব শিকার হয়ে যখন কবি প্রবাসে পরাকাষ্ঠার দিন গুণছেন, এমনই এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বিদ্যাসাগরের পরিচয় দিতে বলছেন, "... he has the genious and wisdom of an ancient sage, the energy of an English man and the heart of a Bengali mother."[৬১]

অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসেন অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "মানুষই তাঁর ধর্ম, মানুষই তাঁর সাধনা, মানুষই তাঁর আধার এবং আধেয়।"[৬২]

আমাদের সকলের নিশ্চয় স্মরণে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার এবং শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে 'ক্ষিরের সমুদ্র'[৬৩] বলে অভিহিত করেছেন, যা তাঁর মানব মহত্ত্বকেই আভাষিত করে। এমনকি স্বামী বিবেকানন্দও বিদ্যাসাগর চরিত্রের 'ত্যাগ, প্রেম ও সংগ্রামী চেতনার' প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে জানিয়েছেন, "রামকৃষ্ণেব পরেই বিদ্যাসাগরের অনুসরণ আমি করি।"[৬৪]

কার্যত কথায় ও কাজে, বিঘোষিত আদর্শে, সমাজজীবনে ও ব্যক্তিজীবনে এমন সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ, মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি এমন অসীম মমতা এবং অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে এমন আগ্নেয় ক্রোধ — উনিশ শতকে অন্য কোনও ভারতীয় সমাজ সংস্কারকের মধ্যে দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। আজ থেকে ৯০ বছর আগে বিদ্যাসাগবের মূল্যায়ন করে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন (ভাদ্র, ১৩০২) সে কথাই আবার স্মরণ করা প্রয়োজন: "আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না, যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না, যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না... বিদ্যাসাগর সর্ববিষয়েই ইহার বিপরীত ছিলেন।... দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষত্ব..."[৬৫]

৭

উপসংহার

পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা কতিপয় বিশেষ সিদ্ধান্ত টানতে পারি, প্রথমতঃ, বিদ্যাসাগরের 'শিক্ষা সংস্কারে' ঘটেছে বিজ্ঞানমনস্কতার সার্থক ব্যক্তকরণ। সেই উদ্বেল আগ্রহেই তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিবিধ বিষয়কে (গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূ-বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞান) সরস করে পরিবেশনার উদ্যোগে 'বোধোদয়' পুস্তক রচনা করেছেন, ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যতালিকায় বিজ্ঞানকে আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে গ্রহণের সুপারিশ করেছেন, নিজ রচিত প্রশ্নপত্রে বিজ্ঞানের প্রশ্নকে সযত্নে চয়ন করেছেন, বিজ্ঞানের প্রতি জনগণের আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্যোগে বিজ্ঞানীদের কষ্টবহুল জীবন চরিত রচনা করে প্রচার করেছেন, দুরূহ ইংরাজী শব্দের প্রতিশব্দ রচনায় নিজেই ব্রতী হয়েছেন সকলের আগে, জনগণকে ফলিত বিজ্ঞানের ক্রিয়াকলাপে কৌতূহলী করতে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভায় উৎসাহে সমর্থন জানাতে এগিয়ে এসেছেন ব্যাকুলতা নিয়ে, সাহিত্যের পণ্ডিত হয়েও বিস্ময়কর আগ্রহে চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ নিয়েছেন পরিণত বয়েসে—অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়েছেন দক্ষ চিকিৎসকে। অতল অনুসন্ধিৎসাই বিদ্যাসাগরকে করে তুলেছে বিজ্ঞানপ্রেমী ও বিজ্ঞানরসিক।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা লক্ষ্য করি তাঁর বিচিত্র সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান-মনস্কতার সার্থক ব্যবহারিকরণ। যুক্তি, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যায় বিন্দুমাত্র পিছু হন নি তিনি। তাঁর সংস্কার প্রণালীর ধারাপথ অনুসরণ করলে দেখব, কী বিধবা বিবাহ, কী বহু বিবাহ সবেতেই তিনি জনমানসের সামনে শাস্ত্রের উদ্ধৃতি তুলে তার ব্যাখ্যা করে সকলকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর সংস্কার প্রযুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত স্বকল্পিত আখ্যান নয়, বা কোন চাপানো পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নয়, এ সংস্কৃতি দেশজ, এ চিন্তা-চেতনা আমাদের মুনি, ঋষিদের প্রজ্ঞাপ্রসূত। কেবল সংস্কার সাধনেই নয় দেশ সেবার কাজে—যখন দুর্ভিক্ষে মানুষ ক্ষুধায় আত্মহারা বা ম্যালেরিয়া মহামারীতে মানুষ মৃত্যুর মোকাবিলায় অসমর্থ—তিনি তখন ধৈর্য্য হারাননি মোটেই; যথাসাধ্য সমস্যাকে তথ্যসহ বিবৃত করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে যত্নবান হয়েছেন নিজে এবং পরিশেষে সরকারি আনুকূল্য আদায় করে এনে দিয়েছেন সর্বহারা নিঃস্ব

মানুষদের সামনে ; প্রয়োজনে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেই এসে দাঁড়িয়েছেন সমস্যা জর্জর অস্পৃশ্য আমজনতার মাঝে।

তৃতীয়তঃ, সিদ্ধান্ত মনঃসংস্কারেও তিনি দেখিয়েছেন বিজ্ঞান মানসিকতার সার্থক আত্মীকরণ। তিনি তথাকথিত বিজ্ঞান অনুরাগী বা বিজ্ঞানের ছাত্র হতে চান নি, যারা পড়ার সময় বিজ্ঞান পড়ে আর কার্যক্ষেত্রে সে প্রত্যয়ে বিচ্যুত হয়, যারা মুখে এক বলে কাজে অন্য করে, যারা উপলক্ষ্যের জন্য উদ্দেশ্যকে বিসর্জন দিতে বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করে না— সে স্ববিরোধিতায় বিদ্যাসাগর থাকেন না। সেখানে তিনি অনন্য ও একক। তাই পরোপকারের জন্য ঋণগ্রস্ত হতে তাঁর বাধে না ; আদর্শচ্যুতির অপরাধে একমাত্র প্রিয় পুত্রকেও চিরতরে বর্জনের জন্য কাঁদেননি এতটুকু, সৎকর্মের জন্য সহস্র প্রতিশক্তিকে আহ্বান করেন আগ্রহে, দায়িত্বহীনতায় ক্ষমা করেন নি নিজের শিক্ষককে ও অতি প্রিয় বন্ধুকে ; সত্য রক্ষার জন্য মুহূর্ত সিদ্ধান্তে জন্মভূমিচ্যুত হয়েছেন জীবনের মত। সত্যের পূজারী যিনি— তিনি কি কখনো মিথ্যার সঙ্গে আপসে নামতে পারেন ? তাই তিনি সার্থক বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানমনস্কতার অধিকারী।

পরিশেষে বলব শতকের যথেষ্ট বিশেষণের অধিকারী বিদ্যাসাগরের সার্থক উপমা এসেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে—সেই 'ক্ষীরেব সমুদ্র' অভীধায়। বস্তুত তিনি তাই, তিনি শুধু জ্ঞানী নন, দাতা নন, মরমী মানব নন--- তিনি চৈতন্যাসীন মান হুঁসও। তাই নিজ পরিবার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব থেকে সরে থেকেছেন স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসনে। এ বুঝি কবি কণ্ঠের সেই কাব্য কথা—'আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর'? তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, নিজ বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অন্তর্লীন থেকেও—ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতায় শুষ্ক হয়েও যুগমানবতার যে মূর্ত প্রকাশ তিনি অক্ষয় রেখেছিলেন তার রসদ এসেছিল বিজ্ঞানমনস্কতার সিঁড়ি বেয়ে। তাই তাঁর শ্রদ্ধা তর্পণে আমরাও বিনয় ঘোষের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি, "তিনি শুধু ইনটেলেকচুয়াল হিউম্যানিস্ট নন; তিনি হিউমেন্ হিউম্যানিস্ট—যিনি কর্ম ও সাধনা দিয়ে চেয়েছেন মানুষের অধিকারে সেই মানুষের প্রতিষ্ঠা : ফাইটার ফর রাইট্স অব ম্যান অ্যান্ড হিউম্যানিজম্।"